জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিক্ষোভ

সংগ্রামী হাতিয়ার

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র

নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

ডিসেম্বর, ২০১৯ ■ ৪৮তম বর্ষ ■ অষ্টম সংখ্যা ■ মূল্য দু'টাকা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনিশতম রাজ্য সম্মেলন

অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মোকাবিলায় চাই অকুতোভয় মানসিকতা ও ইস্পাত দৃঢ় সংগঠন

উদ্বোধক তপন সেন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯তম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো, গত ২৫-২৭ ডিসেম্বর, ২০১৯ পূর্ব বর্ধমান জেলার বর্ধমান শহরে। শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন তথা গণআন্দোলনের ইতিহাস সমৃদ্ধ এই শহরে রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার এবং প্রাক্তন সাংসদ ও গণআন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্ব মহঃ সেলিম। সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান শহরের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নগর এবং সম্মেলন স্থল সংস্কৃতি লোকমঞ্চের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড সুকোমল সেন মঞ্চ। সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপনী কেন্দ্রের নামকরণ করা হয়েছিল কমরেড অশোক রায় প্রগতিশীল পুস্তক বিপনী কেন্দ্র। প্রায় আটশ প্রতিনিধির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলন তিনদিন ধরে পরিস্থিতি উপযোগী সংগঠন গড়ে তুলে রাজ্য সরকারী কর্মচারী তথা শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থরক্ষায় উপযুক্ত ভূমিকা পালনের বিষয়টি আলোচনা করে। সম্মেলনের শেষদিনে স্থানীয় টাউন হল ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় প্রকাশ্য সমাবেশ।

বিশেষ অতিথি মহঃ সেলিম

পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ

প্রধান অতিথি এ. শ্রীকুমার

পুনর্নির্বাচিত যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী

সংগ্রামী হাতিয়ারের বিশেষ সংখ্যার উদ্বোধন করছেন মহঃ সেলিম

দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ অনিবার্য কারণে রাজ্য সম্মেলন সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট ও ছবি এই সংখ্যায় প্রকাশ করা গেল না। পরবর্তী সংখ্যায় ঐ রিপোর্টগুলি প্রকাশিত হবে।—পত্রিকা সম্পাদক

মিছিল, রক্তপতাকা উত্তোলন ও শহীদ বেদীতে মাল্যদান

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান শহরের নামকরণ হয় কমরেড অজয় মুখোপাধ্যায় নগর এবং সম্মেলন স্থান ''সংস্কৃতি লোকমঞ্চ''-এর নামকরণ হয় কমরেড সুকোমল সেন মঞ্চ। তিনদিন ব্যাপী রাজ্য সম্মেলনের প্রথম দিন ২৫ ডিসেম্বর, ২০১৯ সকাল ৯টায় সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিদের একটি সুসজ্জিত মিছিল শহরের বড়োনীলপুর এলাকা থেকে শুরু হয়। বিভিন্ন জেলা, অঞ্চল ও সমিতি থেকে আগত প্রতিনিধিরা নিজ নিজ ব্যানার ও লালপতাকা হাতে মিছিলে যোগ দেন। সম্মেলন উপলক্ষে বর্ধমান শহর ছিল লাল পতাকায় মোড়া। স্লোগান মুখরিত সুদীর্ঘ মিছিলটি জি.টি রোড ধরে ক্রমশ সম্মেলন মঞ্চের দিকে এগোতে থাকে। মিছিলটিকে দেখার জন্য স্থানীয় মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। রাস্তায় বহু জায়গায় মানুষের ভিড় জমে যায়। রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলির ছাদে ও বারান্দায় বাড়ির মহিলারা এসে জড়ো হন। সি আই টি ইউ সহ বিভিন্ন বামপন্থী গণ সংগঠন ও গণআন্দোলনের কর্মীরা নানা জায়গায় মিছিলটিকে স্বাগত জানিয়ে পুষ্পবৃষ্টি করেন ও লাল সেলাম জানান। মিছিলটি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সম্মেলন স্থান কমরেড সুকোমল সেন মঞ্চের (সংস্কৃতি লোকমঞ্চ) সামনে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মেলন মঞ্চের সামনে একটি পার্কে জড়ো হয়। সেখানে রক্তপতাকা উত্তোলন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য। এরপর শুরু হয় শহীদ বেদীতে মাল্যদানের অনুষ্ঠান। প্রথমে শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন সংগঠনের সভাপতি অসিত কুমার ভট্টাচার্য। তারপর মাল্যদান করেন ঊনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধক, সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন। তারপর মাল্যদান করেন প্রধান অতিথি, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক এ. শ্রীকুমার। এরপর মাল্যদান করেন অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি, বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট চিকিৎসক অনুপ সাহা। এরপর একে একে মাল্য দান করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ, যুগ্ম-সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদকত্রয় যথাক্রমে স্মরজিত রায় চৌধুরী, জ্যোতিপ্রসাদ বসু ও অনন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সংগ্রামী হাতিয়ার পত্রিকার সম্পাদক সুমিত ভট্টাচায, ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম-আহ্বায়ক তপন দাশগুপ্ত, বর্ধমান জেলার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও প্রাক্তন সাংসদ সইদুল হক, অল বেঙ্গল মিউনিসিপাল ওয়ার্কার্স

চতুর্থ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ কলমে

সম্পাদকীয়

ঊনিশতম রাজ্য সম্মেলন, সাধারণ ধর্মঘট ও সমকালীন সময়

সদ্য সমাপ্ত রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনিশতম রাজ্য সম্মেলন (২৫-২৭ ডিসেম্বর, '১৯) এবং তার কয়েকদিন পরেই অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সাধারণ ধমঘট (৮ জানুয়ারি, ২০২০)-এর মধ্যবর্তী ও পরবর্তী সময় ও পরিবেশ, আমাদের অভ্যস্ততার বাইরে এক ভিন্ন চেহারা নিয়ে হাজির হয়েছে। যা একই সাথে দারুণ আশাবাদ ও সতর্কতার কারণ হতে পারে। আশাবাদের কারণ হলো সামাজিক আন্দোলনগুলিতে বর্তমান সময়ে সৃষ্ট স্বতঃস্ফূর্ততার বাঁধ ভাঙা ঢেউ। ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-আর্থিক সঙ্গতি- রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেভাবে মানুষ রাস্তায় নামছেন, তার সম্ভবত কোনো অতীত নজির স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে নেই। এমনকি বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের মাঝামাঝি সময়ে (১৯৭৫) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আরোপিত জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে যে গণআন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে শ্রীমতী গান্ধীর পতন ও গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল, স্বতঃস্ফূর্ততার মাপকাঠিতে তাকেও ছাড়িয়ে যাচ্ছে বর্তমান সময়। জরুরি অবস্থা বিরোধী আন্দোলনে বিপুল স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল, ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য শাসকের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহস এবং আত্মত্যাগের মানসিকতা। এগুলি যেমন ঠিক, তেমনি একথাও ঠিক যে, ঐ স্বতঃস্ফূর্ততা কোনো একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে পরিচালিত না হলেও, একেবারে নেতৃত্ব বিহীন ছিল না। ইন্দিরা কংগ্রেস বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তি এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এবং চরিত্রের দিক থেকে ছিল বিশুদ্ধ রাজনৈতিক। সংবিধান, সাংবিধানিক অধিকারের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ। কিন্তু বর্তমান সময়ে যে স্বতঃস্ফূর্ততা তা কোনো কেন্দ্র থেকে তো নয়ই, এমনকি শুধুমাত্র আর এস এস-বি জে পি বিরোধী রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিকে সামনে রেখেও পরিচালিত হচ্ছে না। অর্থাৎ জরুরি অবস্থা বিরোধী গণঅন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছিল অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত স্বতঃস্ফূর্ততা। কিন্তু বর্তমান সময়ে সি এ এ, এন পি আর, এন আর সি বিরোধী আন্দোলনের স্বতঃস্ফূর্ততা অনেকাংশেই বিনিয়ন্ত্রিত। এবং এর চরিত্রও বিশুদ্ধ রাজনৈতিক নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক চরিত্রের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ। বর্তমান সময়ে প্রতিবাদ আন্দোলনের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো বিপুল সংখ্যায় ছাত্র-যুব ও মহিলাদের অংশগ্রহণ। দিল্লীর শাহিনবাগ ও কলকাতার পার্ক সার্কাস ময়দানে প্রবল শীতকে উপেক্ষা করে, মহিলারা, এমনকি কোলে শিশু নিয়েও যেভাবে লাগাতার অবস্থান বিক্ষোভ করছেন তা নজিরবিহীন। আবার শুধু এই দুটি শহরেই নয়। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিসহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলিতেও প্রায় প্রতিদিনই মহিলারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন। মহিলাদের পাশাপাশি ছাত্রদের অংশগ্রহণও তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতোই। আমাদের দেশে বেশ ককেয়টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যেগুলির পঠন-পাঠনের উন্নত মানের জন্য যেমন পরিচিতি রয়েছে, তেমনি পরিচিতি রয়েছে সেখানকার গণতান্ত্রিক পরিবেশ, মতবৈচিত্র্যকে ধারণ করার ক্ষমতা এবং সুস্থ বিতর্কের পর্যাপ্ত পরিমণ্ডলের জন্য। ফলে ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত পড়ুয়াদের প্রতিবাদী চরিত্র এক সহজাত প্রবণতা। তাই ঐ সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা যখন কোনো সামাজিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, তখন তা বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। কিন্তু বর্তমান সময়ে ছাত্রদের প্রতিবাদ কার্যত যে গণ প্রতিবাদের চেহারা নিয়েছে, তার অভ্যন্তরে বিস্ময়কর উপাদানটি হলো, সাধারণভাবে যে বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি চরিত্রগতভাবে কিছুটা ভিন্ন ধরনের, যেগুলি সুপরিচিত প্রধানত ছাত্র-ছাত্রীদের 'ক্যারিয়ার' গঠনের উন্নত মানের কর্মশালা হিসেবে, সেগুলির ক্যাম্পাস থেকেও প্রতিবাদী গর্জন শোনা যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা সংহতি জানাচ্ছে, অপর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি। এইভাবেই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে আই আই টি-র ছাত্র-ছাত্রীরা এবং জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আই আই এম বা সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্র-ছাত্রীরা মানসিকভাবে একাত্ম হয়ে পড়ছে, যা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোনো বিশেষ সাংগঠনিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই একাত্মতা বা যোগসূত্র তৈরি হচ্ছে, তা কিন্তু নয়। অনেকটাই স্বতোৎসারিত সমাজমুখীনতা যেন এক প্রান্তের সাথে আর এক প্রান্তকে জুড়ে দিচ্ছে। তাই জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐশী ঘোষ যখন আক্রান্ত হন, তখন সেন্ট জেভিয়ার্সের ছাত্ররা ক্লাসরুম থেকে বেড়িয়ে এসে প্রতিবাদে ফেটে পড়ছে। কিছুদিন আগেও এই দৃশ্য ছিল বিরল।

অনেকাংশেই সাংগঠনিক যোগসূত্রহীন এই যে ছাত্র সংহতির মালা গড়ে উঠছে, তার জন্য কেউ কেউ সোশ্যাল মিডিয়াকে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিতে চান। কিন্তু এই বিশ্লেষণ সম্ভবত সবটা ঠিক নয়। সোশ্যাল মিডিয়া নিমেষে সর্বত্র সংবাদ সংবহনের কাজটা করে এটা ঠিক। কিন্তু সেই সংবাদের প্রাপক যে ছাত্রসমাজ, তাদের চেতনায় সমাজমুখীনতার কপাটটা যদি খোলা না থাকতো, তাহলে সোশ্যাল মিডিয়া প্রেরিত সংবাদ ও দৃশ্য এই ধরনের হিল্লোল কখনও তৈরি করতে পারতো না। তাই এক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটকের ভূমিকা পালন করলেও, মূল (সামাজিক) বিক্রিয়কের ভূমিকা পালন করেছে—প্রথমত, বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশুনার খরচের বিপুল বৃদ্ধির কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত যা, বিশ্ব বিদ্যালয়গুলির বশংবদ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নামিয়ে আনা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে আর এস এস পরিচালিত এ বি ভি পি নামধারী ছাত্রসংগঠনটির বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপপ্রয়াস। তৃতীয়ত, দেশের শাসকদলের পক্ষ থেকে ক্রমান্বয়ে ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা এবং ইতিহাস ও পুরাণের অবৈজ্ঞানিক সংমিশ্রণ এবং সর্বোপরি সাম্প্রদায়িক বিভাজনমূলক নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন। ছাত্র সমাজের বয়সোচিত যে সহজাত আবেগ, যা অনেকাংশে ক্যারিয়ার, প্রতিযোগিতা, সাফল্য ইত্যাদির শেকলে বাঁধা ছিল, তা উপরোক্ত বিষয়গুলির একযোগে ধাক্কায় খুলে গেছে, ফলে রাজপথ আজ ছাত্রদের দখলে। সন্দেহ নেই এই সময়ে আবার ছাত্ররা কেন রাজনীতি করবে? ছাত্রদের কাজ লেখাপড়া করা ইত্যাদি বস্তাপচা বুলির প্রচার আবার জোরকদমে শুরু হবে ছাত্রদের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুমগুলিতে মুখ গুঁজে রাখার জন্য। তবে বর্তমান সময়ে সম্ভবত এই টোটকায় কাজ হবে না।

মহিলাদের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে চলে আসা সংস্কারের চৌম্বকক্ষেত্র, যা তাদের গৃহকোণ আবদ্ধ করে রাখে, তা থেকে ছিটকে বেড়িয়ে আসার ক্ষেত্রে সমাজের অভ্যন্তরে মহিলাদের ওপর ক্রমবর্ধমান হিংসা, সমাজে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে পরিচালিত শাসকের মনুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী এবং সর্বোপরি নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন একযোগের ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমান সময়ের সামাজিক আন্দোলনে যে স্বতঃস্ফূর্ততা পরিলক্ষিত হচ্ছে, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, নয়া উদারবাদী অর্থনীতি সমাজের অভ্যন্তরে 'বিচ্ছিন্নতা' বা 'অ্যালিয়েনেশনের' তত্ত্ব আমদানি করে। অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ এক একটি পৃথক স্বত্বা। তার ভালো-মন্দ, চাওয়া-পাওয়া ইত্যাদির সবকিছুর দায়ভার শুধু তারই। তার নিজের স্বার্থেই প্রয়োজনে অপরকে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে হটিয়ে দিয়ে নিজের জায়গা দখল করতে হবে—এই যে বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব ভিত্তিক সামাজিক গতি নয়া উদারবাদী অর্থনীতি তার নিজের স্বার্থেই কায়েম করতে চায়, তার বিপরীতমুখীন একটা সামাজিক গতি, একেবারে প্রাথমিক স্তরের হলেও, সৃষ্টি করেছে বর্তমান উপর্যুপরি স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলনগুলি।

এই প্রেক্ষাপটেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ৮ জানুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট। যা প্রকৃত প্রস্তাবেই একটি সংগঠিত রাজনৈতিক আন্দোলন। ৮ জানুয়ারির সাধারণ ধর্মঘট ব্যাপক সাফল্য লাভ করেছে, যেখানে সারা দেশে প্রায় ২৫ কোটি শ্রমজীবী মানুষ অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১২টি রাজ্যে ঐ ধর্মঘট সর্বাত্মক চেহারা গ্রহণ করেছিলে। অন্যান্য রাজ্যেও ধর্মঘটের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। উত্তরপ্রদেশসহ কেন্দ্রের শাসক দলেরই সরকার রয়েছে এমন রাজগুলিতে ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য প্রশাসনিক দমন-পীড়নের পথ গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষকে সন্ত্রস্ত করা যায়নি। আমাদের রাজ্যের শাসকদলটির আচার আচরণ ছিল কেন্দ্রের শাসক দলের মতোই। এরাজ্যেও ধর্মঘটকে ভাঙার জন্য একযোগে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক গুণ্ডামির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু শ্রমজীবী মানুষ সেই আক্রমণকে মোকাবিলা করেই ধর্মঘটকে সফল করেছেন। যে ১২ দফা দাবিতে এই ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল, তার প্রতিটি দাবিই এদেশের শ্রমজীবী মানুষ জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর দাঁড়িয়ে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই, ধর্মঘটের সাফল্য এত সু-উচ্চ শিখরে পৌঁছেছিল—একথা যেমন ঠিক, তেমনই সমকালীন সময়ে সি এ এ, এন পি আর এবং এন আর সি-র বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলন সর্বভারতীয় ধর্মঘটকেন্দ্রিক সংগঠিত প্রচারের চারপাশে সমর্থন ও সংহতির এক বৃত্ত রচনা করেছিল। যা এই ধর্মঘটের সাফল্যকে আরও দুর্ভেদ্য করে তুলেছিল।

এখন সংগঠিত আন্দোলন এবং কেন্দ্রবিহীন স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের মধ্যেকার যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক, তার একটা দিক যদি এটা হয়, তাহলে অপর দিকটি হবে সংগঠিত আন্দোলনের একটি গুরু দায়িত্ব। তা হলো স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলনের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টা না করেও, বাইরে থেকে অবিরাম রসদ যোগানো। যাতে করে স্বতঃস্ফূর্ততায় ভাঁটা না আসে। সংগঠিত আন্দোলনের বিস্তৃতি গোটা দেশজুড়ে। এমনকি গ্রাম ভারতও শ্রমিকশ্রেণীর ধর্মঘটে শামিল হয়েছিল। অপরদিকে স্বতঃস্ফূর্ত সামাজিক আন্দোলনগুলি এখনও মূলত বড় বড় শহরকেন্দ্রিক। একে পরিব্যাপ্ত করার দায়িত্বও সংগঠিত আন্দোলনের। সর্বোপরি যে যে ইস্যুতে সামাজিক আন্দোলনগুলি গড়ে উঠছে, তার মূল কারণগুলি যে নিহিত রয়েছে, সঙ্কটগ্রস্ত নয়া উদারবাদের আত্মরক্ষার্থে সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টির পরিকল্পনা মাফিক হিন্দুত্ববাদকে ব্যবহার করার চক্রান্তের মধ্যে, তা ধরিয়ে দেওয়ার দায়িত্বও সংগঠিত আন্দোলনেরই। কারণ স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন সর্বদা ফলের বিরুদ্ধে ধাবিত হয়। কিন্তু তার অভিমুখকে কারণের দিকে নিবদ্ধ করার দায়িত্ব সংগঠিত আন্দোলনের। এই সমন্বয় সাধনই এখন বড় পরীক্ষা।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সদ্য সমাপ্ত রাজ্য সম্মেলনে এই উভয় ফর্মের আন্দোলন থেকেই রসদ সংগ্রহ করে তা অনুগামী সমাজের মধ্যে সঞ্চারিত করে আগামীদিনে কর্মচারী আন্দোলনকে পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। □

২৫ জানুয়ারি, ২০২০

জাতীয় কাউন্সিল সভা

সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের ন্যাশনাল জেনারেল কাউন্সিল সভা মহারাষ্ট্রর পুণেতে ২৮-৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছে। শহরজুড়ে মিছিল ও শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মাধ্যমে কর্মসূচীর সূচনা হয়। মহারাষ্ট্রর মধ্যবিত্ত কর্মচারী আন্দোলনের নেতা ও অভ্যর্থনা কমিটির চেয়ারম্যান অশোক দাগরে স্বাগত ভাষণের পর কাউন্সিল সভার উদ্বোধন করেন সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় নেতৃত্ব এ কে পদ্মনাভন। সম্পাদকীয় প্রতিবেদন পেশ করেন সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার। তিনি বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতির ও জাতীয় পরিস্থিতির বিশদ ব্যাখ্যা সহ দেশের ফ্যাসিস্টধর্মী আর এস এস বিজেপির বহুমাত্রিক বিভাজনের তীব্র সমালোচনা করেন। বলেন দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র আজ আক্রান্ত। সেইজন্য দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা, মানুষের জীবন জীবিকার স্বার্থে, নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিল সহ ১২ দফা দাবীতে আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২০ সারা দেশ প্রতিবাদে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য বর্ধিত দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। উপস্থিত ২৩টি রাজ্যের প্রতিনিধিরা তাদের আলোচনায় দৃপ্ত কণ্ঠে আগামী ৮ই জানুয়ারি ২০২০ সফল ধর্মঘটের পালনের শপথ গ্রহণ করেন। সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের চেয়ারম্যান সুভাষ লাম্বা সহ সভাপতিমণ্ডলী সভা পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা, যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও সুতপা হাজরা প্রতিনিধিত্ব করেন।

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী ও সুতপা হাজরা প্রতিবেদন ও মহিলা শেষনে আলোচনা করেন। এছাড়া কাউন্সিল সভাতে বার্ষিক হিসাব পেশ করেন সর্বভারতীয় সহ সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিনহা।

প্রতিবেদনের উপর ২৩টি রাজ্য থেকে ১৯ জন মহিলা সহ ৫৭ জন আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন।

কাউন্সিল সভাতে আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২০ ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব সহ ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শেষ দিন ৩০.১২.২০১৯ সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার রিপোর্ট প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনার উপর জবাবী বক্তব্য রাখেন এবং পরে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

সিদ্ধান্ত ও করণীয় ঃ

১। হরিয়ানা রাজ্যের ফরিদাবাদে সুকোমল সেনের নামে হেড কোয়ার্টার্স হবে (প্লট নং-৬৬, সেক্টর-২ডি, ফরিদাবাদ, হরিয়ানা)। ২। আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২০ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘট সফল করার লক্ষ্যে ব্যাপকভাবে সর্বস্তরে চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিতে হবে। ৩। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০, কেন্দ্রীয়ভাবে পেনশনার্স সংগঠনগুলিকে নিয়ে তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে একটি জরুরি সভা হবে। ৪। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২০, রাজ্যে রাজ্যে নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিল, চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন প্রদান, বহুমাত্রিক সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে ও স্ব স্ব রাজ্যের দাবী যুক্ত করে 'জাতীয় দাবীদিবস'-র কর্মসূচী পালন করতে হবে। ৫। আগামী ৮ মার্চ ২০২০, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে সারা দেশজুড়ে মহিলাদের ওপর নৃশংস আক্রমণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কর্মসূচী করতে হবে। ৬। জুলাই-আগস্ট ২০২০, দু'মাস ব্যাপী রাজ্যে রাজ্যে নয়া উদারনীতির ভয়ঙ্কর আক্রমণ এবং নয়া পেনশন ব্যবস্থা বাতিল, চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের সমকাজে সমবেতন, শূন্যপদ পূরণ সহ সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির বিরুদ্ধে ও দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র রক্ষায় এবং রাজ্যের দাবী যুক্ত করে ধারাবাহিকভাবে কর্মসূচী পালন করতে হবে। ৭। পরিস্থিতি ও সাংগঠনিক নীতিগত গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচী প্রস্তাব জাতীয় কাউন্সিল সভায় গৃহীত হয়। ৮। এছাড়া ৫.২৫ একর জমি ক্রয় করে সুকোমল সেন ভবন নির্মণের জন্য তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়। □

নব নির্বাচিত পদাধিকারীগণ

সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস

সহ-সভাপতি গীতা দে

সহ-সভাপতি প্রশান্ত সাহা

সহ-সম্পাদক দেবব্রত রায়

কোষাধ্যক্ষ লিটন পান্ডে

সহ-সভাপতি মানস দাস

দপ্তর সম্পাদক অভিজিৎ বোস

রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ

শত্রু চিহ্নিত করে আক্রমণের সময় এসে গিয়েছে

তপন সেন

সাথী সভাপতিমণ্ডলী, অল ইন্ডিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার, মঞ্চে উপস্থিত অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ঊনবিংশতি সম্মেলনের এই উদ্বোধনী সমাবেশে আগত প্রতিনিধি কমরেডগণ, মা, ভাই, ও বোনেরা

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মতন একটি ঐতিহ্যশালী সংগ্রামী সংগঠনের সম্মেলনে আসা এবং তার উদ্বোধনের দায়িত্ব পাওয়া নিঃসন্দেহে এক গৌরবজনক কাজ। আমি সেই কারণে নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করছি এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি অয়োজকদের। ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকাণ্ডে সম্মেলন এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। এই সাংগঠনিক প্রক্রিয়া পালন করতে হয়, গড়ে তুলতে হয়। আমাদের সাংগঠনিক উদ্দেশ্য এবং তার পিছনে যে দৃষ্টিভঙ্গী, যে মতাদর্শ, যে চিন্তা-ভাবনা এবং যে পরিচিতির ওপর দাঁড়িয়ে আমরা যে সংগঠন পরিচালনা করছি এবং আমাদের অভিজ্ঞতা---এই সবটার পরিপ্রেক্ষিতেই সাংগঠনিক প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। মূল কথা, বিগত সম্মেলন থেকে বর্তমান সম্মেলনের অন্তর্বর্তীকালীন প্রক্রিয়ায় আমাদের মতাদর্শ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে গত তিন বছর নিজেদের কিভাবে পরিচালনা করা হয়েছে, তার সাফল্য এবং দুর্বলতার হিসাব-নিকাশ করা। শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন সংগঠিত করার প্রক্রিয়ায় সমস্ত শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ার মধ্যে দিয়ে এই শোষণ ভিত্তিক ব্যবস্থাটা বদলানোকে লক্ষ্য হিসেবে যারা মনে করে, তাদের সংগঠনের সাথে সাযুজ্য রেখে এই সংগঠনের সম্মেলনেও নিশ্চিত ভাবে সাফল্যকে যেমন চিহ্নিত করতে হবে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি করে আলোচনা করতে হবে কমজোরি কি রয়ে গেছে, ফাঁক কি রয়ে গেছে। আমরা কি করে উঠতে পারিনি একটি সংগ্রামী সংগঠন হিসাবে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনাটা খুব জরুরী। তবেই সম্মেলন আরও শক্তিশালী হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে পারে। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনে, শ্রমজীবী মানুষের সংগঠনে সম্মেলনের এই প্রাথমিক বিষয়টি মাথায় রেখেই যদি সম্মেলন পরিচালিত হয়, তবেই সে পরবর্তী ধাপে এগিয়ে যাওয়ার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারে। গত সম্মেলন থেকে এই সম্মেলনের অন্তর্বর্তী সময়ের কাজ-কর্মের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করার মধ্যে দিয়ে আপনারা আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এই আশা ভরসা রেখেই আমি দু-চারটি কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই।

এক নম্বর হচ্ছে পরিপ্রেক্ষিত—কোন জায়গায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। সাধারণ সম্পাদকের প্রতিবেদনে আমি চোখ বুলিয়েছি। আন্তর্জাতিক, জাতীয়—সব বিষয় রাখা আছে। একে মন দিয়ে অধ্যয়ন করা দরকার, কারণ এই কনটেক্সটে দাঁড়িয়েই আমাদের আজকের দায়, দায়িত্ব, কাজ-কর্মগুলো বুঝতে হবে। এই কনটেক্সটটা কি? এটা শুধু আমাদের দেশীয় বা জাতীয় স্তরের কনটেক্সট নয়। শ্রমজীবী মানুষ যখন তার পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা করবে, তাকে তার জাতীয় স্তরের, তার নিজের কাজের জায়গার পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করতে হবে সারা পৃথিবীতে কি চলছে, কারণ শ্রমিক শ্রেণী একটি আন্তর্জাতিক শ্রেণী। আর যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা কাজ করছি, এটাও একটা আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা। আমাদের দেশে যে অর্থনৈতিক সঙ্কট, আর্থিক পরিস্থিতির লাগাতার নিম্নমুখী হওয়ার যে প্রক্রিয়া, তার প্রতিফলন জনজীবনে ঘটছে। শ্রমিক-কর্মচারীর জীবনে ঘটছে। তাঁদের অধিকার আক্রান্ত হচ্ছে। এটা শুধু আমাদের দেশে নয়, সারা পৃথিবী জুড়েই এই চিত্র দেখা যাচ্ছে। সর্বত্র সঙ্কট। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো ছাড়া সর্বত্র আর্থিক নিম্নগতি লাগাতার অব্যাহত রয়েছে এবং তার প্রধান বোঝাটা শ্রমিক, কর্মচারী, সাধারণ মানুষের ওপরে পড়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় এক ভয়ঙ্কর আর্থিক বৈষম্য ঘটে যাচ্ছে। সারা পৃথিবীতেই হচ্ছে এটা। আমাদের দেশের হিসেবে বলা যায়, তিন শতাংশের হাতে দেশের আশি শতাংশ সম্পদ জমা হয়ে গেছে। আন্তর্জাতিক গ্লোবাল হাঙ্গার ইন্ডেক্সের হিসেবে দেখা যায়, পিছিয়ে থাকা দেশগুলো, বিশেষ করে বিকাশশীল দেশগুলোতে শুধুমাত্র পেট ভরানোর ক্ষেত্রেও অধিক থেকে অধিকতর মানুষ বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এমনকি চরম ধনী দেশগুলোতেও একটা বড়ো অংশের মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হচ্ছেন আর একই সঙ্গে কিছু মানুষের সম্পদ বেড়ে চলছে একটা অশ্লীল প্রক্রিয়ায়। এই বৈষম্যটাই আবার আর্থিক সঙ্কটকে তীব্রতর করছে।

সঙ্কটটা আসলে বাজারের সঙ্কট। আজকে শিল্প জগত তার পরিপূর্ণ উৎপাদন করতে পারছে না কারণ কেনার লোক নেই এবং পরিপূর্ণ উৎপাদন করতে পারছে না বলে নিজেদের বাঁচার তাগিদে শ্রমিক ছাঁটাই করছে। এই শ্রমিকেরাই বাজারে জিনিস-পত্র কিনতে যান। সুতরাং ক্রেতার সংখ্যা কমছে, সঙ্কট আরও বাড়ছে। আর সঙ্কট যত বাড়ছে, তত সেই দেশের শাসক শ্রেণী তাদের পুঁজিপতি শ্রেণীর মুনাফার অসুবিধে পূরণ করতে দেশের সম্পদের দরজা খোলা ছেড়ে দিচ্ছে লুঠ-পাট করে খাওয়ার জন্য। এই চিত্র পৃথিবীর প্রায় সব দেশে।

আমাদের দেশে যেটা নিয়ে আমরা লড়াইয়ের মধ্যে আছি, যে যে বিষয়গুলো আগামী ধর্মঘটের ১২ দফা দাবির মধ্যে দিয়ে আমরা উত্থাপন করছি, তা অন্য সব দেশের থেকে আলাদা নয়। সব দেশে সঙ্কট বাড়ছে এবং সেই সঙ্কটের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধারণ মানুষের ওপরে। যাঁরা শ্রমের মাধ্যমে দেশের সম্পদ উৎপাদন করছেন, তাঁদের উপরেই আক্রমণ নেমে আসছে, ব্যাপক ভাবে আর সরাসরি রাজনীতিতে তার প্রতিফলন ঘটছে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের মধ্য দিয়ে, শ্রমিকদের ইউনিয়ন করার বা অন্যান্য অধিকার হরণের মধ্যে দিয়ে। শ্রম আইনের বদল ঘটানো হচ্ছে এবং সেই বদলের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে প্রায় সব দেশেই। দুনিয়াতে বড়ো বড়ো ধর্মঘট হয়ে গেছে। ফ্রান্সে লাগাতার ধর্মঘট হয়েছে, যার মধ্যে দিয়ে সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছে কয়েক বছর আগে। এখন আবার নতুন ধারায়, নতুন প্রক্রিয়ায় ধর্মঘট শুরু হয়েছে গত ৫ ডিসেম্বর থেকে। এটা মূলতঃ পেনশন রিফর্মের বিরুদ্ধে এবং অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে। তাঁরা চান না অবসর গ্রহণের বয়স বাড়িয়ে বাষট্টি বা অন্য কিছু করা হোক। যতদিন যাচ্ছে ধর্মঘটের দাবির সাথে সাধারণ মানুষের অন্যান্য দাবিও যুক্ত হচ্ছে, ছাত্রদের দাবি দাওয়া যুক্ত হচ্ছে এবং দ্রুত জনগণের অংশগ্রহণ বাড়ছে। ফ্রান্সে প্রায় সারা দেশজুড়ে এই অস্থিরতা বজায় আছে। এক এক জায়গায় এক সময়ে ধর্মঘট আর ব্যাপক জমায়েত সংগঠিত হচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এই অবস্থাটা আছে।

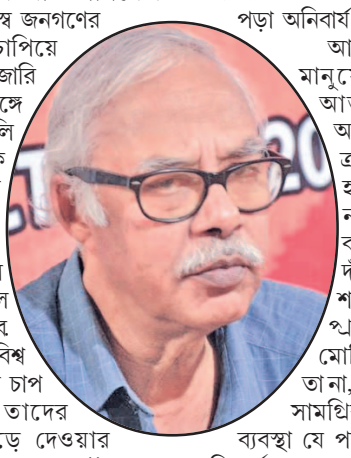

আর একটি দিক হচ্ছে, এইসব দেশে সঙ্কটের প্রতি শাসকের দৃষ্টিভঙ্গী। নিজস্ব জনগণের ওপর বোঝা চাপিয়ে রাখার প্রক্রিয়া জারি রাখার সঙ্গে সঙ্গে ধনী দেশগুলি আন্তর্জাতিক লগ্নী পুঁজির ওপর তাদের প্রভুত্ব থাকার ফলে বিকাশশীল দেশগুলিকে ওপরে বিভিন্ন বিশ্ব সংস্থার মাধ্যমে চাপ সৃষ্টি করছে তাদের বাজারটা ছেড়ে দেওয়ার জন্য। ভাবখানা এমন, ''আমার দেশের ইন্ডাস্ট্রি পরিপূর্ণ উৎপাদন করতে পারছে না, আমি তোমার দেশের বাজার দখল করে আমার দেশে আমি তার ফুল ইউটিলাইজেশন করবো, তাতে তোমার দেশের ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংস হয় তো হোক''! এই প্রক্রিয়াটা নতুন পর্যায়ে খুব আক্রমণাত্মক রূপে শুরু হয়ে গেছে। সাম্রাজ্যবাদ সরাসরি তার আর্থিক, রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বিকাশশীল দেশগুলির ওপর চাপ সৃষ্টি করছে এবং অধিকাংশ বিকাশশীল দেশের সরকার, মূলত দক্ষিণ পন্থী যারা, তারা এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে। আমার দেশও এই ঘটনাচক্রের মধ্যে রয়েছে।

এই মুহূর্তে ভারত সরকার ইরান থেকে তেল আমদানি কমিয়ে দিচ্ছে, কারণ আমেরিকা ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। আমরা ইরান থেকে সস্তায় তেল পাই, আমাদের সুবিধা হয় সেখান থেকে তেল নিতে, আমাদের দীর্ঘ মেয়াদি চুক্তি আছে তাদের সাথে এ ব্যাপারে—তবু ট্রাম্প সাহেব এর বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য চাপ দিচ্ছেন এবং ভারত আত্মসমর্পণ করছে। ভারতে আমদানির বাজার নিয়ন্ত্রণ মুক্ত করতেই এ দেশের সরকারের ওপর আমেরিকা চাপ দিচ্ছে আমদানি শুল্ক এবং অন্যান্য কর কমানোর জন্য অথচ নিজের দেশে তা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক স্তরে যত দ্বিপাক্ষিক, ত্রিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক আলোচনা হয়, তার বেশির ভাগটাই হয় এই চাপ সৃষ্টি করার জন্যে। আমরা যখন আমাদের দেশে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনা করবো, তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে এই চাপের ফল সরাসরি আমাদেরই ভোগ করতে হচ্ছে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে প্রথম যেটা উপলব্ধি করা দরকার, সেটা হলে আমার কর্মস্থলে যে সমস্যা, সেটা ঠিক আমার কর্মস্থলের সমস্যা নয়, এটা এক সর্বজনীন সমস্যা। শুধু জাতীয় ক্ষেত্রে না, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এবং বিষয়টি জুড়ে আছে পুঁজিবাদের সঙ্গে—নয়া উদারবাদী প্রক্রিয়ার যে পুঁজিবাদ আজকে সারা দুনিয়ার ওপর লুণ্ঠন চালাচ্ছে, তার সঙ্গে। আমার কর্মস্থল ভিত্তিক আন্দোলনের প্রতিটা কর্মসূচীর সঙ্গে যদি আমি লাগাতার এই চেতনার উন্মেষ না ঘটাতে পারি, তাহলে আমি আমার কর্মস্থল ভিত্তিক আন্দোলনেও প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবো না। আমার সঠিক শত্রুকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে অসুবিধে হবে এবং তার রাজনৈতিক প্রভাব পড়বে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিম্বা সামাজিক ক্ষেত্রেও তার প্রভাব পড়া অনিবার্য।

আসলে শ্রমজীবী মানুষের চেতনার আন্তর্জাতিকতা আজকের দিনে ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়াচ্ছে নতুবা শত্রুতাটা ব্যক্তিগত হয়ে দাঁড়ায়। আমার শত্রু মুখ্যমন্ত্রী, না প্রধানমন্ত্রী মোদি---ব্যাপারটা তা না, ব্যাপারটা হলো সামগ্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যে পদ্ধতিতে চলছে অনিবার্যভাবে আগামী দিনে তা আরও বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠবে। আমার কর্মস্থলের প্রত্যেকদিনের সঙ্কট এই ব্যবস্থার থেকেই উৎসারিত হচ্ছে। সুতরাং ব্যবস্থাটা সম্পর্কে আমি যদি লাগাতার মানুষের চেতনাকে প্রসারিত না করতে পারি, তবে মনে হবে এই মহিলার বদলে ওই মানুষটা এসে বোধহয় আমার একটা সুবিধা হবে—ব্যাপারটা ব্যক্তিগত স্তরেই থেকে যাবে। ব্যবস্থাগত বিষয়ে আমাদের চেতনা যদি না বাড়ে তাহলে যে রাজনৈতিক সংগ্রামের কথা আমরা বলছি বা এখানে যে সব মনীষীর উদ্ধৃতি আমরা ছাপিয়েছি, সেগুলো সব আনুষ্ঠানিকতাই থেকে যাবে। এটা কোনো নতুন কথা নয়। আপনাদের বহু সম্মেলনেই আমি বিশ্বাস করি এ কথা বার বার বলা হয়েছে। আমার ট্রেড ইউনিয়ন জীবনের শুরুতে মনে আছে ১২ই জুলাই কমিটির বিভিন্ন সভায়, আপনারা যাঁদের আজ স্মরণ করলেন, সেই অজয় মুখার্জী, সুকোমল সেন ইত্যাদিরা বার বার তাঁদের বক্তব্যে এর ওপরেই জোর দিতেন। আমার ধারণা মাঝখানে কিছুদিন এই কথাগুলো আমরা একটু ভুলে গিয়েছিলাম। আমাদের স্মৃতিকে আবার উজ্জ্বল করার দরকার কারণ আজকের দিনে এগুলি অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গত লোকসভা নির্বাচনে আরও বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে মোদি চলে এলো---কী কারণ আছে? স্বাভাবিক কারণ তো নেই, অন্ততঃ এ রাজ্যের জমিতে কোনো কারণ থাকার কথা নয়। কিন্তু দেখা গেল, সমানে 'রাম-বাম', 'বাম-রাম' নিয়ে আলোচনা হয়েছে আর শেষপর্যন্ত ১৮টা সিট নিয়ে একটি সাম্প্রদায়িক দল এ রাজ্যের গৌরবময় আন্দোলনের মুখে কালি ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে। ভাবার দরকার আছে। চেতনার প্রসারের দিক থেকে যদি ব্যাপকতা না থাকে তাহলে মুশকিল। যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই চালাচ্ছি, চেতনার আন্তর্জাতিকতা যদি না থাকে, তাহলে তার আক্রমণের চরিত্রটাও বোঝা সম্ভব নয় আর তার মোকাবিলা করার জন্যে রণনীতি তৈরি করাও সম্ভব নয়। এটা একটা বিশেষ দিক। আমরা নিজেরাও আলোচনা করছি।

সি আই টি ইউ তার সর্বভারতীয় ষোড়শ সম্মেলনে যাচ্ছে আগামী জানুয়ারি মাসে। আমরা খুব গুরুত্ব দিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে চর্চা করার চেষ্টা করছি যে লাগাতার আন্দোলনের পর, দেশব্যাপী ধারাবাহিক আন্দোলনের পরও এমন কেন হলো? ফাঁকটা কোথায় থাকছে? কী মিস করছি আমরা? সম্মেলনে যদি এটা চর্চা না হয় তাহলে তার পরের ব্যাপারগুলোও করা যাবে না। কেন পে-কমিশন আমার কথা শুনছে না, কেন ডি এ বন্ধ করে দিচ্ছে আর তার বদলে আমার যা করার দরকার, কেন করতে পারছি না? এইসব কেনগুলোর জবাব আমাদের আত্ম-মন্থনের মধ্যে দিয়ে বার করতে হবে। যদি আলোচনাটা এই প্রেক্ষিতে আসে যে কার বিরুদ্ধে আমি লড়ছি, কার বিরুদ্ধে চেতনা শাণিত করার দরকার, তাহলে কাজটা সহজ হবে। ব্যবস্থাটা আমার শত্রু, ব্যবস্থার পরিচালকেরা সেই ব্যবস্থার এক একটি এজেন্ট---এটা চেতনায় আনা দরকার।

দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে, আজকের এই সঙ্কটের তীব্রতার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের দেশে একটা দক্ষিণ পন্থী শক্তির ক্ষমতায় আসা। ভাবার বিষয়, যে লোকগুলো আমার মঞ্চে এসে কথা বলেছে বা ধর্মঘট করেছে, সে ঘাস ফুলে ছাপ মেরেছে, কী পদ্ম ফুলে ছাপ মেরেছে কিম্বা কংগ্রেসকে ছাপ মেরে বেরিয়ে চলে গেছে এবং তার লড়াইয়ে যারা তার সঙ্গে ছিল, তাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি—কেন? এই কেনর জবাব পাওয়াটা জরুরি। এটা একটা নতুন দিক।

নয়া উদারবাদী অর্থনীতির সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোনও ফরমুলাতেই সে সঙ্কট থেকে বেরিয়ে আসা যাচ্ছে না। যে ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা সোভিয়েতের পতনের পর বলেছিলেন ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে, সেই তিনিই আবার ২০১৮ সালে এসে বলতে বাধ্য হচ্ছে, ''পৃথিবীতে সমাজবাদের প্রয়োজন আছে... চাহিদার অবনতির ফলেই পুঁজিবাদের সঙ্কটের সৃষ্টি হয়—কার্ল মার্কসের এই নিরীক্ষা যথাযথ ছিল''। নব উদারবাদী প্রক্রিয়ায় সমস্যার সমাধান পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে সমাধানের প্রক্রিয়া টিকে আছে একটাই জায়গায়---ব্যবস্থাটাকে উল্টে দাও। নব উদারবাদ পুঁজিবাদীদের ইনসেন্টিভ দিয়ে বিনিয়োগ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করতে চায়, মনে করে এতে লোকের কাজ হবে, ইকনমি এগুবে। এটাই ওদের দর্শনের মূল কথা। তার ফলেই ট্যাক্স ছাড় এবং জাতীয় সম্পত্তির দরজা ওদের লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দেওয়া, বেসরকারিকরণ ইত্যাদি ইত্যাদি। এই পদ্ধতিকে উলটানো ছাড়া সঙ্কট থেকে বেরানোর কোনো পথ নেই অর্থাৎ পুঁজিবাদীদের উৎসাহ দিয়ে নয়, চাহিদার অপ্রতুলতার কথা মাথায় রেখে জনমুখী অর্থনীতি গ্রহণ করে বিনিয়োগ করতে হবে। সাপ্লাই ম্যানেজমেন্টের বদলে ডিম্যান্ড ম্যানেজমেন্টের জায়গায় যেতে হবে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই আজ এই বিতর্কটা সামনে আসছে। আর এই বিতর্কের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেশের সব কয়টি ট্রেড ইউনিয়ন এক জায়গায় এসে বলছে যে আমাদের এই ১২ দফা দাবি, এই দাবিতে ধর্মঘট আমাদের ৮ জানুয়ারি।

একই সঙ্গে আমরা একটা বিকল্পের কথাও বলছি। যখন নির্মলা সীতারামন কর্পোরেট ট্যাক্স ৪০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২২ শতাংশ করছেন এবং আগামীতে আরও কমিয়ে ১৫ শতাংশের কথা বলছেন, তখন আমরা বিকল্পে বলছি মিনিমাম ওয়েজ ২১০০০ টাকা করো, সমান কাজে সমান বেতন দাও, ঠিকা কর্মীদের কাজের উপযুক্ত বেতন দাও, সবার জন্যে সামাজিক সুরক্ষা দাও, পেনশন সর্বজনীন করো, বেসরকারিকরণ বন্ধ করো, শ্রমিকদের অধিকারকে প্রসারিত করো। একা নয়, সবাই মিলেই এ কথা বলছি, এই দাবিগুলি নিয়ে লড়াই করছি। এই দাবিগুলো নিয়ে ২০০৯-এর পরে তিনটি ধর্মঘট হয়েছে এবং আরও একটি ধর্মঘটের দিকে আমরা এগোচ্ছি।

এই বিকল্পকে মানুষের সামনে নিয়ে আসতে হবে। পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে চেতনাকে শাণিত করার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের আন্দোলনের বিকল্পকে পুঁজিবাদীদের বিকল্পের পাশাপাশি জনতার সামনে নিয়ে আসা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমি শুধু এটার জন্যে লড়ছি না, আমি শুধু ওর বিরুদ্ধে লড়ছি না, আমি এই বিকল্পের পক্ষে লড়ছি, এটা মানুষকে বোঝানো দরকার। যারা এই বিকল্পের বিপ্রতীপে আছে, সামগ্রিক ভাবে তাদের বিরুদ্ধে লড়ছি—এটা বলা দরকার। আমাদের আন্দোলনকে পিন পয়েন্ট করা দরকার এই বিষয়ে। আমাদের বাচন ভঙ্গীকে কতটা এই দিকে নিয়ে যেতে পারছি এবং আমাদের তৃণমূল স্তরে এই চেতনাকে কতটা ছড়িয়ে দিতে পারছি, সেই বিষয়টাও তুল্যমূল্য বিচার হওয়ার দরকার সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে। আপনাদের করণীয় কাজের একটা তালিকা দিয়েছেন রিপোর্টের মধ্যে আমি দেখেছি, কিন্তু আমি মনে করি এর আরও অনেক বেশি পুঙ্খানুপুঙ্খ ডিটেলিং দরকার। এগুলিকে কর্মীদের কাছে তৃণমূল স্তরে আরও কংক্রিট, আরও স্পেসিফিক করে নিয়ে যাওয়া দরকার। কী করা যাবে, আর কী করা যাবে না, সেটাকে নিয়েই তৃণমূল স্তরে যেতে হবে আর সেই কারণে এগুলি নিয়ে আরও চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে বলেই আমি মনে করি---আপনারা বিচার করে দেখবেন আপনাদের আলোচনার মধ্যে দিয়ে।

তৃতীয় বিষয় হচ্ছে, এই সঙ্কটের মধ্যে দাঁড়িয়ে শাসক শ্রেণীর কৌশল। খেয়াল করে দেখবেন, এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের নতুন করে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলো পরাজিত হচ্ছে দক্ষিণ পন্থী শক্তিগুলির কাছে। সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিগুলোর পরাজয়ের কারণ শুধু জনমুখীনতার কথা বলে জনমুখীনতার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে শুধুমাত্র ক্ষমতা দখল করে রাখবার জন্যে সে নয়া উদারবাদকেই আলিঙ্গন করে। এই রাজনৈতিক সুবিধাবাদের প্রতিফলন ঘটেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। যেখানে গণতন্ত্রের ভিত্তি শক্তিশালী, সেখানেই দক্ষিণ পন্থী শক্তিগুলির উদ্ভব ঘটছে জনপ্রিয় স্লোগান দিয়ে। আমেরিকায় ট্রাম্প বললো বিদেশ থেকে সব লোক এসে সেখানকার সব কাজ দখল করে রাখছে বলেই সে দেশে বেকার বেশি। এতে দুটো কাজ হলো—প্রথমত, সেখানকার মানুষের বিশ্বাস আর ভরসা আদায় করা গেল এবং দ্বিতীয়ত সেখানকার শ্রমজীবীদের মধ্যে যাঁরা অভিবাসী

ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

উনিশতম রাজ্য সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশ

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির উনবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের শেষ দিন ২৭ ডিসেম্বর দুপুরে নিকটবর্তী টাউন হল ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে। এই কর্মসূচীটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য পূর্ব বর্ধমান জেলা ও নিকটবর্তী জেলাগুলিতে ব্যাপক প্রচার অভিযান চালানো হয়েছিল। পূর্ব বর্ধমান জেলার কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ ছাড়াও পশ্চিম বর্ধমান, নদীয়া, বাঁকুড়া ও অন্যান্য নিকটবর্তী জেলা থেকে কর্মচারীরা এই সমাবেশে যোগ দেন। সমাবেশ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে টাউন হল ময়দান কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

সমাবেশ শুরু হয় গণ সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। এরপর নব নির্বাচিত সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তারপর বক্তব্য রাখেন পুনর্নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। তিনি বলেন, প্রশাসনের অভ্যন্তরে আমরা আক্রান্ত। ২০১১ সালের পর থেকে চরম আর্থিক বঞ্চনা চলছে। এর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যেতে হবে আমাদের। এই সরকারকে কর্মচারীদের দাবি মানতে বাধ্য করানোর জন্যে ফের নবান্নে হানা দিতে হবে আমাদের। পে-কমিশন কোনো দয়ার দান নয়, এটা কর্মচারীদের হক। পুলিশ লেলিয়ে দিয়ে কর্মচারীদের আন্দোলন দমানো যাবে না। সত্তরের দশকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির অনেক নেতা-কর্মী খুন হয়েছিলেন ও ১৩ জন নেতা বরখাস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু আন্দোলনকে থামানো যায়নি। ৮ জানুয়ারি প্রশাসনকে স্তব্ধ করে দিয়ে ধর্মঘট হবে। এরপর তিনি নব নির্বাচিত ২৭ জন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

সবার শেষে বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি ও সমাবেশের প্রধান বক্তা প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ সেলিম। তিনি বলেন, এক কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের দেশ ও রাজ্য চলছে। বিভিন্ন সমস্যায় মানুষ জর্জরিত। দেশে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কট ও মন্দা চলছে। পেঁয়াজের দাম ১২০ টাকা হয়ে গেছে। সরকারটা যদি চারশো বিশ হয়, তাহলে পেঁয়াজের দাম একশো বিশ কেন হবে না? মানুষ যখন অর্থনৈতিক মন্দার কথা বলছে, তখন দেশের শাসক দল রামমন্দিরের কথা বলছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও দেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। মুখ্যমন্ত্রী তেলেভাজা শিল্পের কথা বলছেন তো প্রধানমন্ত্রী পকোড়া শিল্পের কথা বলছেন। রাজ্যে বিজেপি ও তৃণমূলের লড়াই যেন 'টম অ্যান্ড জেরি'র কার্টুন। এটা দেখলে হবে না, দাবী আদায়ের জন্য লড়াই করতে হবে। ধর্মঘট ভাঙার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর পচা সার্কুলার ছিঁড়ে ফেলে শপথ নিন, লড়াইয়ের ময়দানে আছি, লড়াইয়ে থাকবো। ৮ জানুয়ারি শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারী, ছাত্র, যুব, মহিলা সকলে জোট বেঁধেই সাধারণ ধর্মঘট সফল করবো। বামপন্থীরা ভিক্ষায় বিশ্বাস করে না, এটা হকের লড়াই। সেই লক্ষ্যে সংগঠনকে আরও জোরদার করে প্রকৃত লড়াইয়ের ময়দানে আমাদের নামতে হবে। এখানেই প্রমাণ হবে দেশটা কার। ১৩২ কোটি মানুষের এই দেশ। দুই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধেই লড়াই হবে। দেখা হবে এক পথে এক সাথে ধর্মঘটের দিন।

তিনি আরও বলেন, ৫০ বছরে রেকর্ড বেকারি, ব্যাঙ্ক চৌপাট, জি ডি পি তলানিতে এসে ঠেকেছে। এইসব চাপা দিতে জাতপাত, ধর্ম, ভাষার নাম করে মানুষকে বিভক্ত করতে মরিয়া শাসকদল। এন আর সি, সি এ এ-র নামে মানুষকে ভয় দেখানো হচ্ছে। পুলিশকে দিয়ে নির্যাতন করা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রাম, রাজ্য এবং দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। এরা দেশের শত্রু, মানুষের শত্রু। যারা আমাদের গর্দানে হাত রেখেছে তাদের প্রতিরোধ করতে বামপন্থীদের মানুষের কাঁধে হাত রেখে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে লড়াইয়ে নামাতে হবে। নানা ছদ্মবেশ ধরে যাদের জন্য দেশের এই অবস্থা, তারা মানুষকে ভুল বুঝিয়ে বিভ্রান্ত করছে। যে রাজ্যের মা ভুখা মেয়েকে নিয়ে রেশন চাইতে গেলে বলা হয় আধার কার্ড নেই, তাই রেশন মিলবে না, ক্ষুধা সূচকে সেই দেশের এখন স্থান ১১৯টি দেশের মধ্যে ১০২ নম্বরে। কিছুদিন আগেও যা ছিল ৫৩ নম্বরে। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, চিকিৎসার ব্যবস্থা না করে মন্দির, মসজিদের নামে মানুষকে ভাগ করা হচ্ছে। মানুষকে ভাগ করার জন্যই ধর্মের নামে বিভিন্ন সংগঠন নানাভাবে গজিয়ে উঠেছে। এর প্রতিবাদ করুন। এককাট্টা হতে হবে এর বিরুদ্ধে সব মানুষকে। যারা মানুষের শত্রু তারা গণতন্ত্রেরও শত্রু। এরা মিছিল, মিটিং, ধর্মঘট বন্ধ করতে মরিয়া। এই ফ্যাসিস্ত শক্তি শেষ কথা বলবে না, বলবেন মানুষ। যোগী, মোদি ও মমতা সবাই এক নীতি নিয়ে চলছে। তিনি বলেন, আপনারা কর্মচারীদের স্বার্থে নবান্নে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলতে, কিন্তু আপনাদের বদলি করে দেওয়া হলো দূর-দূরান্তে। ব্রিটিশরাও স্বাধীনতা আন্দোলনকে দমন করতে, আন্দামান সেললুলার জেলে পাঠিয়েছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকারীদের। তাই বলে কি স্বাধীনতা আন্দোলন থেমে ছিল? কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতাদেরও রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে বদলি করে সংগঠনকে ভাঙতে পারবেন না ওরা। সরকার মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের মাইনে বাড়ালো, কিন্তু যে কর্মচারীরা কাজ করেন তাঁদের মহার্ঘভাতা দিতে অস্বীকার করছেন। সেটা কাটমানি হিসেবে সরে গিয়েছে। মহম্মদ সেলিম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, দিলীপ ঘোষরা হুমকি দিচ্ছেন ২ কোটি মানুষকে বাংলা ছাড়া করবেন। বাংলাটা কি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি! দেশে সংবিধান আছে, আইন আছে; স্বাধীনতা জন্মসূত্রে অধিকার, নাগরিকত্বও জন্মসূত্রে—তাই তা সিন্নি বা প্রসাদ নয় যে বিলি করবেন যেভাবে খুশি। পেঁয়াজ, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে—তা নিয়ে কোনো হেলদোল নেই রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের। বরঞ্চ ওরা মজা লুটছেন। সেলিম স্মরণ করিয়ে দেন, ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইন যখন সংশোধন করা হয়, তখন কেন্দ্রের মন্ত্রী ছিলেন মমতা ব্যানার্জী। তখন কোনো প্রতিবাদ করেননি তিনি। ২০০৫ সালে রাজ্যে নির্বাচনের আগে তিনিই সংসদে এন আর সি চেয়ে নথি ছুড়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, এ রাজ্যের ২০০৬ সালে ভোটার লিস্টে বাংলাদেশীদের নাম বাদ দিয়ে ভোট করতে হবে। এখন বলছেন এন আর সি করতে দেব না। মুখ্যমন্ত্রী মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছেন, তাঁর দলের লোকেরাও তাঁর কথা বিশ্বাস না করে ভোটার, রেশন, আধার কার্ড সংশোধন করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। সেলিম মুখ্যমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, বাস্তিল দুর্গ, বাতিস্তা দুর্গ গড়া হয়েছিল—সে ইতিহাস মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় জানেন। কিন্তু মানুষ খেপলে কোনো দুর্গ টিকবে না। এই জন্য মানুষের কথা শুনতে হয়। রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট, রাজ্যে ডি এম, এস পি-রা মনে করছেন সিভিল সার্ভিস নয়, তাঁরা দিদির সার্ভিসের লোক। গণতন্ত্রের টুঁটি চেপে ধরেছে ওরা, ফ্যাসিবাদের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তিনি বলেন, কালা প্রশাসনের কাছে আওয়াজ পৌঁছে দিতে 'ইনকিলাম জিন্দাবাদ' বলুন সোচ্চারে। সব মানুষকে সাথে নিয়ে লড়াই শুরু করুন। ইতিহাস বলে, মানুষকে ভাগ করা এত সহজ নয়—একটি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল দিয়ে ১৩২ কোটি মানুষকে ভাগ করা যাবে না। সর্বত্র এই রাজ্যের মতো পুলিশিরাজ চলছে। প্রতিবাদী মানুষকে যখন কোনোভাবেই বাগে আনা যাচ্ছে না, তখন সেনা প্রধানকে নামানো হয়েছে। উল্টো পথে হাঁটছে সরকার, মানুষকেই সোজা পথে হাঁটাতে হবে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে।

মহম্মদ সেলিমের ভাষণের পর প্রকাশ্য সমাবেশের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি আশিস ভট্টাচার্য। □

রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত

রাজ্য স্তরের দাবি-দাওয়া সম্পর্কিত প্রস্তাব

প্রায় এক দশকের কাছাকাছি সময় জুড়ে রাজ্যে বর্তমান শাসকের অবস্থান। সর্বগ্রাসী নৈরাজ্যের দ্যোতক বর্তমান শাসক দলের কার্যকলাপে বাড়তি মাত্রা যোগ হয়েছে উগ্র জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িক এবং অবশ্যই পুঁজিবাদের একনিষ্ঠ সেবক কেন্দ্রীয় শাসকদলের বর্ধিত তৎপরতায়।

গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক, সুস্থ সংস্কৃতি এবং মানবসম্পদসহ সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আগুয়ান এই রাজ্যটিকে প্রকৃতপক্ষে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করানো হয়েছে। জনগণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে সরকার অনুপস্থিত। গ্রামীণ অর্থনীতি ধ্বংসের অতলে ধাবমান। মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং সম্পদ ও রাজস্ব সংগ্রহে একসময়ের শীর্ষাভিমুখী পশ্চিমবঙ্গ এখন দ্রুতগতিতে নিম্নাভিমুখী। সমস্ত নির্বাচিত সংস্থাগুলি ভেঙ্গে দিয়ে প্রশাসকের আড়ালে রাজনৈতিক মাতব্বরদের বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। জনগণের মৌলিক অধিকারগুলি দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য হয়ে উঠেছে ক্রমশ। জনগণের নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। কল্যাণকামী রাষ্ট্রের সর্বময়তা বদলে প্রশাসনের ভূমিকা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। স্বাধীনতা পরবর্তী দেশভাগের যন্ত্রণা ও তার আর্থসামাজিক প্রভাব কাটিয়ে ওঠার দীর্ঘ সংগ্রাম শেষে সত্তরের দশকের শেষভাগ থেকে একুশ শতকের শুরু পর্যন্ত মানুষের অধিকার কায়েম করে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজের নিচুতলা পর্যন্ত প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এখন রুদ্ধ। প্রচারসর্বস্ব কর্মসূচী, বাজারী মিডিয়া হাউসের স্থূল চাটুকারিতা, পুঁজিপতি ও বৃহৎ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষাকারী এই রাজ্য প্রশাসন বাংলার সংগ্রামী জনগণের কাছে কল্পনার অতীত।

ব্যাপক নির্বাচনী সন্ত্রাস এরাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিকতা পেয়েছে। মানুষের রায় মাথা পেতে নিতে ভয়, তাই ভয়ঙ্কর নির্বাচনী সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। শ্রমজীবী তথা রাজ্যের সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক কার্যকলাপ দমনে অযাচিতভাবে পুলিশকে ব্যবহার করা, শ্রমজীবীদের আর্থিক ও পেশাগত দাবিদাওয়াসহ স্বাধীনতায় আস্থাহীন ও ভীত শাসকদল ট্রেড ইউনিয়ন কার্যকলাপে দমনপীড়ন নামিয়ে আনে প্রশাসনকে ব্যবহার করে। একের পর এক অর্জিত অধিকারগুলি কেড়ে নেওয়া নয়তো অভিমুখগুলিকেই ঘুরিয়ে দেওয়া অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন বা মজুরীপ্রাপ্ত সকলপ্রকার স্থায়ী, অস্থায়ী বা চুক্তিতে নিযুক্ত এবং অবসরপ্রাপ্ত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক এবং শ্রমিকের ভবিষ্যৎ প্রবল সঙ্কটের মুখে। সমস্ত অর্জিত অধিকারগুলি প্রায় কেড়ে নেওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত। কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতার দাবিকে নস্যাৎ করে দেওয়ার চেষ্টা আছে রাজ্যের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশে। সরকারও তাই-ই চায় এবং আদালতে তদরূপ সওয়ালও করেছে। ধর্মঘটের অধিকার এই রাজ্যে কেড়ে নেওয়ার অপচেষ্টা অব্যাহত। প্রশাসনকে নামিয়ে দেওয়া হয় কর্মচারী সহ শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলন দমনের কাজে। বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের প্রেক্ষাপটে রাজ্য বেতন কমিশনের দীর্ঘ বিলম্বিত প্রকাশ এবং তার প্রয়োগে স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রমজীবীগণ আক্রান্ত। অস্থায়ী ও চুক্তিতে নিযুক্ত কর্মচারী সহ অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমজীবীগণ পথে নেমে আন্দোলন করছেন আর সরকার তাদের আক্রমণ করছে, দমনপীড়ন নামিয়ে আনছে, কারাগারে নিক্ষেপ করছে এই হচ্ছে বর্তমান বাংলার চরম বাস্তবতা।

সর্বাধিক উদ্বেগের বিষয় যে কেন্দ্রের ও রাজ্যের দুই শাসক প্রতিযোগিতামূলক সাম্প্রদায়িকতায় মেতেছে। এর এক মারাত্মক অভিমুখ আছে যা হলো মানুষের মৌলিক অধিকার, নিত্য প্রয়োজন এবং গণতান্ত্রিক চিন্তাচেতনা থেকে তাদের বহুদূরে সরিয়ে দেওয়া যায়। জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখতে তাঁদের অস্তিত্বকেই বিপন্ন করার খেলায় মেতেছে দুই শাসক। এন আর সি, এন পি আর, ই ভি পি, আধার ও প্যানকার্ড সংযুক্তিকরণ, ডিজিটাল রেশন কার্ড এই সকল বিষয়ে মানুষকে ব্যস্ত রেখে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনযন্ত্রণাকে অবদমিত করে রাখার কৌশল।

উপরোক্ত সমস্ত বিষয়গুলিকে নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে সংগঠনের থেকে পাঠানো চিঠির পাহাড় জমেছে। বাগাড়ম্বরপূর্ণ ঘোষণা আর বাস্তবে তার প্রয়োগ এই দুইয়ের মধ্যে আসমান-জমীন ফারাক। ফেলে আসা তিনটি বছরে সংগঠন বিভিন্ন প্রকার দাবিদাওয়া নিয়ে একের পর এক বিক্ষোভ, সভা-সমাবেশ, মিছিল, অবস্থান, গণ-ডেপুটেশন এবং শাসকের রক্তচক্ষু অস্বীকার করে ধর্মঘটসহ পর পর আন্দোলনের কর্মসূচীতে পা মিলিয়েছে। বস্তুতপক্ষে এই সময়কালে যেটুকু, যা কিছু আর্থিক বা অধিকারগত দাবি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে তা রাস্তায় নেমে আন্দোলন ভিন্ন অন্য কোনো পন্থায় সম্ভব হয়নি।

উপরোক্ত বাস্তবতাকে মান্য করে মহতী এই সম্মেলন দাবি জানাচ্ছে যে—

(ক) ট্রেড-ইউনিয়নসহ সমস্তপ্রকার গণতান্ত্রিক অধিকার পালনে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চলবে না।

(খ) রাজ্যের জনগণের নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য সরবরাহে রেশনিং ব্যবস্থাকে কার্যকর ভূমিকা নিতে হবে। সেই নিরিখে চালু প্রকল্পগুলি তুলে দেওয়া চলবে না। পেট্রোল, ডিজেল, রান্নার গ্যাসের দাম কমানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের শুল্ক হ্রাস করতে হবে।

(গ) দীর্ঘ সংগ্রামলব্ধ অর্জিত অধিকার কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা বকেয়াসহ প্রদান করতে হবে এবং তা চালু রাখতে হবে।

(ঘ) পে-কমিশনের বঞ্চনামূলক বিষয়গুলি সংশোধন করে অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় ২০১৬ সাল থেকেই এর আর্থিক সুবিধা প্রদান করতে হবে।

(ঙ) প্রশাসনের সমস্ত শূন্যপদগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পি এস সি'র মাধ্যমে নিয়োগ সংক্রান্ত বামফ্রন্ট সরকারের আদেশনামা পুনরায় চালু করতে হবে।

(চ) প্রশাসনে হয়রানিমূলক বদলী, ইনক্রিমেন্ট আটকে দেওয়া, ধর্মঘটের কারণে ডায়েস-নন, দাবি-দাওয়ার আন্দোলনের কারণে গ্রেপ্তার, আন্দোলনের কর্মসূচীতে পুলিশ লেলিয়ে দেওয়া ইত্যাদি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।

(ছ) রাজ্যে সুস্থ গণতান্ত্রিক ও অসাম্প্রদায়িক পরিবেশ রক্ষা করতে রাজ্য সরকারকে সদর্থক ও কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। বাবরি মসজিদ সম্পর্কিত উচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশাসনকে সতর্ক ও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

(জ) অনিয়মিত কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, স্থায়ী কর্মচারীদের ন্যায় সমস্ত আর্থিক সুযোগসুবিধা প্রদান এবং তাঁদের ৬০ বছর পর্যন্ত কাজ করার পূর্ণ সুযোগ ও অধিকার দিতে হবে।

(ঝ) ওয়ার্ক চার্জড্ কর্মচারীদের নিয়মিতকরণের আদেশনামা অকার্যকর করে রাখা হয়েছে। তা পুনরায় কার্যকর করে তাদের নিয়মিতকরণ করতে হবে।

(ঞ) প্রশাসনের স্থায়ী পদগুলি অবলুপ্তির প্রক্রিয়া বন্ধ করে সমস্ত শূন্যপদে স্থায়ী কর্মচারী নিয়োগের প্রক্রিয়া চালু করতে হবে।

(ট) এ. জি.-কে এড়িয়ে রাজ্য সরকারের বেতনভুকদের আর্থিক বিষয়গুলি পরিচালনার দায়িত্ব নিজের হাতে নিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

(ঠ) প্রশাসন ও রাজ্য সরকারী কর্মচারী সংগঠনগুলির নিয়মিত মতামত আদানপ্রদানের প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। □

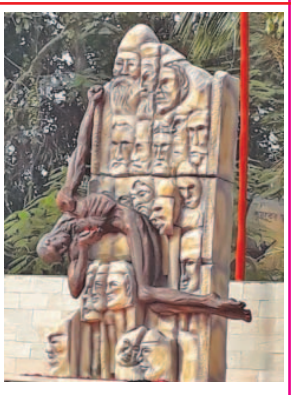

সম্মেলন উপলক্ষে রাশিয়ার একটি স্মৃতিসৌধের অনুকরণে নির্মিত শহীদ বেদী

শহীদ বেদীতে মাল্যদান

প্রথম পাতার পর

ফেডারেশন-এর সাধারণ সম্পাদক দীপক মিত্র, যুক্ত কমিটির সাধারণ সম্পাদক তাপস ত্রিপাঠী, সি আই টি ইউ পূর্ব বর্ধমান জেলার সম্পাদক সুকান্ত কোনার, গণেশ চৌধুরী, ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক জয়দেব দাশগুপ্ত, অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক ও সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী। এছাড়াও শহীদ বেদীতে মাল্যদান করেন কে এম ডি এ-র সাধারণ সম্পাদক গৌতম মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন-এর নীলকমল সাহা ও কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী সমিতিসমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতা প্রদীপ গুপ্ত। শহীদ বেদীটি তৈরি করা হয় রাশিয়ার একটি ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের অনুকরণে। ফ্যাসীবাদ বিরোধী লড়াইতে রাশিয়ার দু'কোটি মানুষের আত্মবলিদানের স্মৃতিতে সৌধটি তৈরি হয়েছিল। □

ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরী

সংগ্রামের মাটিতে রচিত নতুন ইতিহাস রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯তম রাজ্য সম্মেলনের প্রতিনিধি অধিবেশন

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯তম রাজ্য সম্মেলনের মূল মঞ্চ ছিল বর্ধমান শহরের লোক-সংস্কৃতি প্রেক্ষাগৃহ। গৌরবোজ্জ্বল ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারের অবসানের পরেই এখানকার মাটি রক্তাক্ত হয়েছিল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে থাকা মানুষের নৃশংস হত্যালীলায়। কিন্তু সংগঠনের ডাক পেয়ে সংশয়কে দূরে ফেলে অথবা আত্মত্যাগের মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেই জেলার অকুতোভয়, সংগ্রামী সংগঠক-কর্মীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এবং সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের সাহায্যকে পাথেয় করে পশ্চিমবঙ্গের কর্মচারী সমাজের জন্য সংগ্রামের ময়দান প্রস্তুতের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সজাগ ছিলেন সারা রাজ্য থেকে আগত প্রতিনিধিরা যেন সম্মেলনের মহতী প্রক্রিয়া সুন্দরভাবে সম্পন্ন করতে পারেন। প্রস্তুত ছিলেন যে কোনো অনাহুত, অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার। সে অর্থে এই মঞ্চ ছিল সত্যি এক 'সংবেদনশীল রনাঙ্গন'। প্রথম দিন ২৫ ডিসেম্বর '১৯ উদ্বোধনী অধিবেশনের পরে দ্বিতীয়ার্ধে যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরীর প্রতিবেদন পেশ এবং কোষাধ্যক্ষ লিটন পাণ্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাবে পেশের মধ্য দিয়ে প্রতিনিধি অধিবেশন শুরু হয়। আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং রাজ্য পরিস্থিতির গতি-প্রকৃতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা সহ বিশ্বজিৎ গুপ্তচৌধুরী বলেন, বিগত তিন বছরে প্রতিকূল পরিবেশে সরাসরি সংগঠনের উপর রাজ্য প্রশাসনের আক্রমণের কাছে মাথা নত না করে যেভাবে সংগঠন তার ধারাবাহিক কাজ করে চলেছে, প্রতিনিয়ত লড়াই সংগ্রামের রূপরেখা রচনা ও প্রতিপালন করেছে তা সংগ্রামের নতুন ইতিহাস রচনা করেছে। কর্মচারীসমাজ বিপুল বঞ্চনা মাথায় করে সংগ্রামের ময়দানে সংগঠনের হাত শক্ত করেছে। রচিত হয়েছে বিকাশ ভবন অভিযান, নবান্ন অভিযানের মতো স্বতঃস্ফূর্ত জঙ্গী আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। শাসকশ্রেণীর সংগঠন ভেঙে দেওয়ার নোংরা চক্রান্ত ব্যর্থ করেই কর্মচারী স্বার্থে আদর্শে অবিচল থেকে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তার শ্রমজীবীদের পক্ষে থাকা শ্রেণী চরিত্রের প্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রতিবেদন পেশের পরেই মোট ২৩টি খসড়া প্রস্তাব পেশ করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক মানস দাস এবং প্রস্তাবগুলির সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অপর সহ-সম্পাদক অনুপ বিশ্বাস। উদ্বোধক সি আই টি ইউ-র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তপন সেন-এর বক্তব্যের দিশাকে অনুসরণ করে প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। দু'দিন ব্যাপী মোট ৩০টি সমিতি, সহযোগী সমিতি এবং নবগঠিত ঝাড়গ্রাম, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমানসহ ২১টি জেলা ও কলকাতার ৭টি অঞ্চলের মোট ৬১জন প্রতিনিধি ৬০০ মিনিটেরও বেশি সময় ধরে সমগ্র উপস্থাপিত বিষয়বস্তুর ওপর তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে সম্মেলনে উপস্থাপিত করেন। আলোচনায় রাজ্য, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সহ বর্তমান সময়ে সংগঠন পরিচালনায় কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং সমিতিগত সমস্যা, সামাজিক সমস্যাগুলি এবং সেগুলি থেকে উত্তোরণের প্রস্তাবসহ বহুধারায় প্রতিনিধিরা আলোচনা করেন যা সত্যিই আগামীদিনের সংগঠনের পথ চলার সহায়ক হতে পারে। সব থেকে বেশি যে তিনটি বিষয়ে প্রতিনিধিরা জোর দিয়েছেন সেগুলি হলো দপ্তরগুলিতে নিয়োগ না হওয়ায় কর্মচারী সংখ্যা কমে যাওয়া এবং সংগঠন শক্তির ক্ষয়, প্রশাসনে চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীর সঙ্গে সংগঠনের সমন্বয় ও তাদের সংগঠিত করার বিষয় এবং এই দুটির বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ৮ জানুয়ারির ধর্মঘট কর্মসূচীর সফল রূপায়ণ। শুধু আশু সমস্যার আলোচনার মধ্যেই নিহিত ছিল না রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের জীবনজীবিকার প্রশ্নে সংগঠনের দীর্ঘস্থায়ী পথ চলার দিকনির্দেশক চিন্তা-চেতনা। বক্তব্য পেশের সময় নব প্রজন্মের নেতৃত্বের শারীরিক ভাষায় ছিল না কোনো জড়তা, বরং তা স্পষ্ট, মেজাজী এবং আদর্শগত চিন্তা-চেতনা আর মেধায় ভরপুর ছিল। বর্তমান পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সামগ্রিক সমাজ পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁদের আলোচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এক কথায় সময়ের বাস্তবতাকে এই সম্মেলন ধারণ করতে পেরেছে এবং আগামী দিনের করণীয় সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগ্রহণে অনেকটাই সফল হয়েছে।

৮ জানুয়ারি ২০২০ দেশজোড়া ধর্মঘটের সমর্থনে প্রস্তাব উত্থাপন করেন সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ।

পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলি থেকে আগত প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, সর্বত্র মানুষের সমস্যাগুলির থেকে তাদের চিন্তাভাবনাকে অন্যদিকে পরিচালিত করা হচ্ছে বিভিন্নভাবে মানুষকে বিভাজন করে ও ব্যতিব্যস্ত রেখে। অসহায় মানুষ উপায় খুঁজতে উগ্র দক্ষিণপন্থার কবলে পড়ছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নির্বাচিত সরকারগুলিকে উৎখাত করতে সাম্রাজ্যবাদী তৎপরতা নোংরা খেলা খেলছে। এর বিরুদ্ধে দেশে দেশে মানুষ লড়াই করছে। সর্বত্র ধর্মঘট, অবরোধ ও প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে। আমাদের দেশের সরকার ট্রাম্প প্রশাসনের দোসর হয়েছে। আচ্ছে দিনের স্বপ্ন দেখিয়ে বেহাল অর্থনীতি, আকাশ ছোঁওয়া জিনিসের দাম, সর্বোচ্চ বেকারত্ব প্রভৃতি জনগণকে উপহার দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। প্রতিবাদী মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করছে নানাভাবে, ধর্মের নামে, জাতের নামে, মন্দির-মসজিদ দেখিয়ে। এন আর সি, নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে সারা দেশের মানুষকে ব্যতিবস্ত করে রেখেছে। আমাদের রাজ্যের সরকারও পেছিয়ে নেই। বিজেপি-আর এস এস-এর সাথে সবসময় ছদ্ম বিরোধিতার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিভাজনকেই উসকানি দিয়ে চলেছে। আইন-শৃঙ্খলার অবনতি, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, সিন্ডিকেট, কাটমানি, মিথ্যাচার, রাজ্যের রাজনৈতিক সংস্কৃতি হয়েছে। প্রশাসন দলদাসে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র বিরোধীশূন্য করতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ব্যাপক সন্ত্রাস করে গণতন্ত্রের গলা টেপা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের থেকে বলা হয়েছে যে, পরিস্থিতির অবনতির কারণে সেখানের আগের মতো গণতান্ত্রিক কর্মসূচী পালন করা যায় না। একই কথা জঙ্গলমহল কিম্বা দক্ষিণ ২৪ পরগনা বা পূর্ব মেদিনীপুর সহ দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রেও সত্য। বাঁকুড়ায় প্রশাসন দ্বারা জেলা দপ্তর ভেঙে দেওয়া কিম্বা কাকদ্বীপে মহকুমা দপ্তর পুড়িয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা এসব প্রমাণিত করে। আবার মহকুমা, জেলা কিম্বা কেন্দ্রীয় স্তরের অসংখ্য নেতৃত্ব-কর্মীকে এসময় বদলী করা হয়েছে দূর-দূরান্তে, সংগঠনকে দুর্বল করতে। কর্মসূচী পালনের দিনে প্রশাসন আটকেছে কর্মচারীকে, নানাভাবে হেনস্তা করা হয়েছে। কিন্তু এসব করেও সংগ্রামী সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটিকে ভাঙা যায় না তা সদস্যরা প্রমাণিত করেছে। বর্তমান সময়ে সংগঠনে প্রযুক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা এসেছে প্রতিনিধিদের বক্তব্যে। প্রচারে সোসাল মিডিয়া, হোয়াটস্ অ্যাপ ইত্যাদিকে ব্যবহার করার বিষয়ে কর্মশালা করার প্রস্তাব দেন তাঁরা। অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলি তাদের আলোচনায় সমিতিগত সামগ্রিক বিষয়ের পাশাপাশি নিজস্ব সমিতির সমস্যা, ক্যাডারগত সমস্যা, বেতন স্কেলের সমস্যা, নিয়োগ না হওয়ায় সদস্য সংখ্যা কমে যাওয়ায় কর্মসূচী পালনের সমস্যা ইত্যাদি এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পরিচর্যার বিষয়, ছোট সমিতিগুলি মার্জ করার প্রসঙ্গ ব্যক্ত করেন। তবে সকলেই চুক্তিপ্রথার কর্মচারীদের সাথে প্রশাসন ও সংগঠনগত সমস্যার বিষয়টি বলেছেন এবং তাদের সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পেয়েছে।

রাজ্য সরকার বিগত আট বছরে বিপুল বঞ্চনা করেছে কর্মচারীদের প্রতি। আট বছর ধরে মহার্ঘভাতার বিপুল টাকা দেয়নি। চার বছর ধরে পে-কমিশনকে ঠুঁটো করে রেখে যা ঘোষণা করা হয়েছে তা চরম বঞ্চনার নামান্তর। ডিএ দেবার কথা বলা হয়নি, বাড়িভাড়া ১৫ থেকে ১২ শতাংশে নামিয়ে আনা হয়েছে, পেনশনার্সদের ন্যূনতম সুবিধা দেওয়া হয়নি। বারংবার আবেদন করে, নবান্ন অভিযান, পে-কমিশন দপ্তর অভিযান এসব সফল কর্মসূচীতে কর্মচারীদের জঙ্গী মনোভাব সরকার বুঝতে পারেনি। তাই কর্মচারীরা এখন সরাসরি সংঘাতের পথেই যেতে চান বলে জানিয়েছেন প্রতিনিধিরা। ৮ জানুয়ারি ধর্মঘটে সর্বাত্মক সফল করার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন তাঁরা।

সাধারণ সম্পাদক তাঁর জবাবী ভাষণে বলেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা মানুষের সমস্যার সমাধান করতে পারে না তা আজ প্রমাণিত। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের পথেই এবং সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে মানুষের মৌলিক সমস্যার সমাধান হতে পারে। ষাটের দশকে আধাফ্যাসিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই আন্দোলনের জন্য শিক্ষক-কর্মচারীদের যৌথ প্ল্যাটফর্ম ১২ই জুলাই কমিটি গড়ে তোলা হয়েছে। আজকের সময়ে যে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে সেই প্রেক্ষিতে ১২ই জুলাই কমিটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আর্থিক দাবীতে কখনোই কোর্টে যায়নি। কোর্ট আমাদের পথ নয়। পথই আমাদের রাস্তা। রাজ্যের শাসকদল যদি আমাদের কথা না শোনেন তাহলে পুনরায় আমাদের নবান্নে যেতে হবে। প্রত্যক্ষ, আরও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে আমাদের যেতে হবে। Offennce is the best defence. Enough is enough.

আমাদের সংগঠন গণতান্ত্রিক। আমাদের সংগঠনে ট্রেড ইউনিয়ন গণতন্ত্রতা নেই, কখনই বলা যাবে না। এই সময়ে আমাদের ধৈর্য রাখতে হবে। ঐক্য বজায় রাখতে হবে। চুক্তি প্রথার কর্মচারীদের আমাদের সংগঠিত করতে হবে। দপ্তরে নিয়োগ নেই, স্থায়ী চাকরি নেই। অসংগঠিত, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের সংখ্যাই বেশি। Striking force হিসেবে এরাই ভূমিকা নিতে পারে।

● রাজ্য সম্মেলনের পূর্বে ৯০ শতাংশ ব্লকেই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সম্মেলন করা গেছে। সংগঠনকে মজবুত করতে হবে। আমাদের ইতিহাস, দলিল চর্চা করতে হবে।

● ৮ জানুয়ারি, ২০২০, সারা ভারত সাধারণ ধর্মঘট দেশের শ্রমজীবীরা ডাক দিয়েছে। আমরাও তাদের অংশ হিসেবে এই ধর্মঘটে যোগ দেব। তাই, ধর্মঘট সর্বাত্মক সফল করতে আমাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে।

ক্রেডেনশিয়াল কমিটি ঃ

● **সভাপতিমণ্ডলী ঃ** শ্রী অসিত ভট্টাচায, সুনির্মল রায়, প্রশান্ত সাহা, শ্রীমতি গীতা দে। ● **অনুলিখন কমিটি ঃ** বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী, সুতপা হাজরা, দেবলা মুখার্জী, রুবী সিনহা, শাশ্বতী মজুমদার, সুচেতা সাহা, পাপিয়া অধিকারী।

● **প্রতিনিধি যাঁরা বক্তব্য রাখেন ঃ**

● জলপাইগুড়ি—মনোজিৎ দাস। ● ও. বে. সার্ভে অ্যান্ড ড্রয়িং এমপ্লয়িজ অ্যাসো ঃ শ্রীকান্ত মাইতি। ● বাঁকুড়া ঃ তরুণ চক্রবর্তী। ● পঃবঃ গ্রামীণ ভূমি সংস্কার কর্মচারী সমিতি ঃ অতনু মিত্র। ● মুর্শিদাবাদ ঃ সঞ্জয় কুমার সাহা। ● নবমহাকরণ ঃ আশীষ মিত্র। ● কোচবিহার ঃ ধীরাজ কুমার রায়। ● ও. বে. নার্সেস এ্যাসোঃ ঃ নিবেদিতা দাশগুপ্ত। ● উত্তর দিনাজপুর ঃ আশীষ কর। ● কলকাতা উত্তরাঞ্চল ঃ প্রশান্ত ঘোষ ● পঃবঃ ওয়ার্ক এ্যাসিস্ট্যান্টস্ এ্যাসো ঃ সুব্রত কুমার গুহ। ● হাওড়া ঃ অসিত দাস। ● পঃ বঃ গ্রুপ ডি সরকারি কর্মচারী সমিতি ঃ অলোক ভট্টাচার্য। ● পূর্ব বর্ধমান ঃ বিদ্যুৎ দাস। ● পশ্চিম বর্ধমান ঃ সুজিত মুখার্জী। ● কলকাতা পূর্বাঞ্চল ঃ দেবশংকর সিনহা। ● রাইটাস বিল্ডিংস গ্রুপ ডি কর্মচারী সমিতি ঃ উত্তম দাস। ● বীরভূম ঃ সৌমেন চ্যাটার্জী। ● ও. বে. ডেয়ারি ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড এ্যানিম্যাল হাসব্যানড্রি ওয়ার্কস ইউনিয়ন ঃ সুকুমার বেরা। ● মালদা ঃ সুবীর রায়। ● ও. বে. সাব-অর্ডিনেট ফরেস্ট সার্ভিস অ্যাসোঃ—উল্লাস নাথ। ● ওঃ বেঃ রেজিস্ট্রেশন এমপ্লয়িজ অ্যাসোঃ—অশোক দাস। ● কলকাতা দক্ষিণাঞ্চল ঃ পঙ্কজ চক্রবর্তী। ● কৃষি কারিগরি কর্মী সংস্থা ঃ রুদ্রকান্ত ভট্টাচার্য। ● নদীয়া ঃ বিশ্বজিৎ চৌধুরী ● ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ঃ সোমনাথ পোদ্দার। ● ফায়ার সার্ভিস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ঃ দেবাশীষ তালুকদার। ● হুগলী ঃ শম্ভু সেনগুপ্ত। ● পুরুলিয়া ঃ রামাশীষ চৌধুরী। ● পশ্চিমবঙ্গ সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি ঃ কিংশুক বিশ্বাস। ● পঃবঃ সমবায় অডিটর্স এ্যাসো ঃ অরিন্দম দাস। ● দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ বিভাস দাস। ● ওঃ বেঃ গভঃ প্রেস ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ঃ বাবলু ঘোষ। ● পঃ বঃ ভেটেরিনারি ফার্মাসিস্ট এ্যাসো ঃ বিমান মাইতি। ● পঃ বঃ পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতি সমূহের যৌথ কমিটি ঃ সন্দীপ রায়। ● পূর্ব মেদিনীপুর ঃ সুকুমার ভট্টাচার্য ● পঃবঃ সাব-অর্ডিনেট ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিস এ্যাসোঃ—সুমনকান্তি নাগ। ● ওঃ বেঃ লাইভস্টক ডেভেলপমেন্ট এ্যাসিসটেন্ট এ্যাসো ঃ জনা মুর্মু। ● পশ্চিম মেদিনীপুর ঃ প্রদ্যুৎ সরকার। ● ওঃ বে. সেক্রেটারিয়েট এমপ্লঃ এ্যাসো ঃ প্রনব কর। ● দার্জিলিং ঃ মৃত্যুঞ্জয় সরকার। ● মহাকরণ অঞ্চল ঃ সন্দীপ দত্ত। ● ওঃ বেঃ সাব-অর্ডিনেট এগ্রিকালচার এন্ড হর্টিকালচার সার্ভিস এ্যাসোঃ ঃ সুদীপ সামন্ত। ● পঃ বঃ রেকর্ড সাপ্লায়ার্স এ্যাসোঃ ঃ পরিতোষ দাস। ● ঝাড়গ্রাম ঃ সত্যবান সাউ। ● হাইকোর্ট এমপ্লয়িজ এ্যাসো ঃ অপর্ণা তলাপাত্র। ● উত্তর ২৪ পরগনা জেলা ঃ পার্থপ্রতিম গোস্বামী। ● গভঃ ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল এমপ্লয়িজ এ্যাসো ঃ চন্দন সেনরায়। ● উদ্বাস্তু ও ত্রাণ পুনর্বাসন ঃ রাজীব দে। ● জুনিয়র ফিসারিজ গ্রেড-২ সার্ভিস এ্যাসোঃ ঃ বাণীপ্রসাদ মিশ্র। ● আলিপুরদুয়ার ঃ গোপাল ব্যানার্জী। ● পঃবঃ রাজ্য সরকারি পেনশনার্স সমিতি ঃ সত্য বসু। ● পঃবঃ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্মচারী সমিতি ঃ প্রদীপ কুমার ঘোষ। ● পঃবঃ জনস্বাস্থ্য কারিগরি কর্মচারী সমিতি ঃ দুলাল মজুমদার। ● পঃবঃ ড্রাইভার্স এন্ড মেকানিকাল ওয়ার্কাস ইউনিয়ন ঃ অর্জুন মান্না। ● দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ রজত সাহা। ● লবণহ্রদ ঃ অভিজিৎ দাস। ● পঃবঃ সরকারি কর্মচারী সমিতি (ডব্লিউ বি এম ও) ঃ সুখেন্দু কুণ্ডু। ● পঃবঃ ডাইরেক্টরেট এমপ্লয়িজ এ্যাসোঃ ঃ নিখিল রঞ্জন পাত্র। ● কলকাতা মধ্যাঞ্চল ঃ জ্যোতির্ময় দত্ত। সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। সম্মেলনের প্রধান অতিথি, সারা ভারত রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক এ শ্রীকুমার এবং কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারী সমিতি সমূহের কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক জনার্দন মজুমদার।

পরবর্তীতে খসড়া প্রস্তাবাবলীর আলোচনার ওপর জবাবী বক্তব্য পেশ করেন অন্যতম সহ-সম্পাদক মানস দাস।

নিরীক্ষত আয়-ব্যয়ের হিসাবের আলোচনার ওপর জবাবী বক্তব্য পেশ করেন কোষাধ্যক্ষ লিটন পান্ডে। এছাড়াও দুটি ডকুমেন্ট সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।

● ২৭ ডিসেম্বর অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী বক্তব্য পেশ করেন। পরবর্তীতে প্রতিনিধি পরিচিতি বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেন আশীষ ভট্টাচার্য।

৬১ জন প্রতিনিধির আলোচনাকে সূত্রায়িত করে জবাবী বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। উপস্থিতি বিষয়ে রিপোর্ট পেশ করেন দপ্তর সম্পাদক দেবব্রত রায়।

সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক সম্মেলনের বিশেষ অতিথি প্রাক্তন সাংসদ তথা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা মহম্মদ সেলিমকে পুষ্পস্তবক ও পুস্তক দিয়ে অভ্যর্থনা করার পরবর্তীতে মহম্মদ সেলিম উপস্থিত প্রতিনিধিদের সামনে তাঁর বক্তব্য পেশ করেন। সংগঠনের মুখপত্র সংগ্রামী হাতিয়ার-এর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেন মহম্মদ সেলিম।

পদাধিকারীদের নামের প্রস্তাব পেশ করেন বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ এবং তা সমর্থন করেন বিদায়ী যুগ্ম সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

উপস্থিত প্রতিনিধিরা এই প্রস্তাব সমর্থন করার পরবর্তীতে সম্মেলন মঞ্চে প্রথম কেন্দ্রীয় কমিটির সভা থেকে কর্মরত মধ্য থেকে ৭ জন (কো-অপঃ সদস্য), এবং অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে থেকে ৯জন কো-অপঃ সদস্যকে নিয়ে মোট ১০৬ জনের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং ২৭ জনের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলী নির্বাচিত হয়। পদাধিকারীসহ সম্পাদকমণ্ডলীর নামের তালিকা পৃথকভাবে দেওয়া হলো। আন্তর্জাতিক সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। □

ইন্দ্রজিৎ রায়চৌধুরী, সৌমেন ঘোষ ও দেবাশীষ রায়

রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

আছেন, তাঁদের সাথে সেখানকার নাগরিকদের মধ্যে একটা সংঘর্ষ তৈরি করার পথ খুলে গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে যখনই পুঁজিবাদ বেকায়দায় পড়ে, তখনই তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ছিন্নভিন্ন করার এ এক নতুন কৌশল শাসক শ্রেণীর। এটা শ্রমজীবী আন্দোলনের বোঝা দরকার। তারা বিশেষ করে বেকারত্বের স্লোগান দেয়, বেকারদের চাকরি দেওয়ার স্লোগান দেয়।

কর্মহীনতা এখন গোটা বিশ্বেই এক বিস্ফোরণের চেহারা নিচ্ছে। দু'রকম ভাবে এই কর্মহীনতা তৈরি হচ্ছে—এক, সঙ্কটের জন্য যাঁদের কাজ ছিল, কাজ হারাচ্ছেন এবং দুই, যাঁরা নতুন কাজের বাজারে ঢুকছেন পড়াশোনা শেষ করে, তাঁরা কাজ পাচ্ছেন না। আর এই দিকটাই ওরা ধরে নিয়েছে, যেটা সোশ্যাল ডেমোক্রেটরা পারেনি। আমাদের দেশেও তথাকথিত প্রগতিশীল পুঁজিপতিরা এই দিকটাকে ধরতে পারেননি। মোদি এসে স্লোগান দিয়েছেন বছরে দু'কোটি চাকরি দেওয়ার। সেটা দেনটি অন্য কথা, কিন্তু বাজি মেরে দিয়েছে প্রথম চালেই। পরের বারে কী করছে সেটা আপনারা দেখছেন, কিন্তু প্রথম বারে এই চালটাই তিনি দিয়েছিলেন। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা পৃথিবীতেই দক্ষিণ পন্থী শক্তি এটাকে ব্যবহার করছে, আর এটাই মানুষের নজরকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে মূল জায়গা থেকে। মানুষ উপায়ন্তর না দেখেই ওদের ভোট দিচ্ছেন। এটাই চলছেই আর এটা গোটা পৃথিবীর ম্যাপে সাময়িক হলেও কিছু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, যেটা মারাত্মক এবং ভয়ঙ্কর চিন্তার ব্যাপার, কারণ এটা গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকেই চ্যালেঞ্জ করছে। সর্বশেষ ব্রেক্সিট নিয়ে ইংল্যান্ডে কনজারভেটিভ পার্টির জয়, জেরমি করবিনের পরাজয়। করবিন বলেছিলেন আমি সব ন্যাশনালাইজ করে দেবো, সবাইকে কাজ দেবো, মিনিমাম ওয়েজ বাড়াবো, পেনশনের অধিকারকে প্রসারিত করবো—তবু জিততে পারলেন না, কারণ তিনি ব্রেক্সিট নিয়ে দোলাচলে ছিলেন। অন্যদিকে বরিস জনসন স্লোগান দিলেন যে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে থাকলে ইংল্যান্ডের কোনো ভবিষ্যৎ নেই, সুতরাং বেরিয়ে আসতে হবে। এতেই তিনি বাজি মেরে দিলেন এবং ব্যাপক মার্জিনে জিতলেন।

আমাদের দেশ এই বিশ্ব-পরিস্থিতির থেকে আলাদা কিছু না, সেই উপলব্ধি নিয়েই ব্যাপারটাকে দেখতে হবে এবং সেই অনুযায়ী আমাদের রণনীতি এবং আগামী দিনের কর্মসূচী ঠিক করতে হবে। এটা খুব জরুরী আজকে। প্রতি মুহূর্তে তারা নতুন নতুন পদ্ধতি আবিস্কার করছে এবং করবে মানুষের নজর মূল বিষয় থেকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। একই সাথে বিভাজন এবং নজর ঘুরিয়ে দেওয়ার কৌশল কাজ করছে এবং করবে আমার শত্রু শিবিরের মধ্যে। একে প্রতিরোধ না করতে পারলে এবং এর বিরুদ্ধে কাউন্টার বক্তব্য তৈরি করতে না পারলে আমাদের আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া মুশকিল। বিকল্পকে সামনে নিয়ে এসে আমাদের আক্রমণাত্মক লড়াইয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা এবার এসে গিয়েছে। পরিস্থিতির চাহিদা এটাই।

দুদিক থেকে আক্রমণ আসছে—একটা সরাসরি আপনার অধিকারের ওপর আক্রমণ এবং অন্যটা, সমাজের মধ্যে লাগাতার একটা দাঙ্গার পরিস্থিতি জিইয়ে রাখা। এই সরকার এসেই ৩৭০ ধারার বিলোপ করলো, ইউ এ পি এ আইন সংশোধন করলো দানবীয় ভাবে যাতে যে কোনো লোককে আতঙ্কবাদী বলে গ্রেপ্তার করা যাবে এবং যাকে গ্রেপ্তার করা হবে তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে সে আতঙ্কবাদী নয়, আর তার পরপরই এন আর সি-র জিগির চালু করে দিলো। এর পরেই সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পেশ করলো সংসদে এবং সেটা পাশও করালো সংখ্যার জোরে। অবশ্য সে সংখ্যা আমরাই হাতে তুলে দিয়েছি 'রাম-বাম' করে এবং তারা সে সুযোগ কাজে লাগিয়েছে।

এখন মানুষ বুঝতে পারছে যে কি সাঙ্ঘাতিক ফাঁদে তারা পা দিয়েছে এবং এই বুঝতে পারার ফলেই সারা দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। এই আন্দোলনের দিশা একমুখী নয়। যে সংঘাতের আবহাওয়া তৈরি করা হয়েছে দেশজুড়ে তার শিকারও কেউ কেউ হয়ে পড়ছে। উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকার আন্দোলনগুলিকে সাম্প্রদায়িক চেহারা দেওয়ার জন্যে নানা প্ররোচনা তৈরি করার চেষ্টা করছে। ভেবে দেখুন, আমার পেটের বিষয়টি, আমার রোজগারের বিষয়টি, আমার অধিকারের বিষয়টি, দেশের বড়ো বড়ো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা বিকিয়ে যাওয়ার বিষয়টি সেখানে পেছনে চলে যাচ্ছে। এটাও ষড়যন্ত্রের একটা অংশ। সিদ্ধান্ত করেই রেল বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। রেলওয়ে বোর্ডকে ভেঙে ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ম্যানেজমেন্ট অথরিটি তৈরি হয়েছে। প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের ক্ষেত্রেও একই করা কাজ করা হয়েছে। সমস্ত ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ক্ষেত্রেও এই ভয়ঙ্কর চেহারাটা আসছে ধ্বংসাত্মক রূপ নিয়ে। এই কোম্পানিগুলি বিক্রি হয়ে গেলে এগুলি আর থাকবে না। বিশেষ করে তেল কোম্পানি বিক্রি হলে যারা কিনবে, তারা ইচ্ছে করেই এদেশে উৎপাদন বন্ধ করে দিয়ে বিদেশ থেকে নিজেদের কোম্পানির জিনিস এখানে বিক্রির ব্যবস্থা করবে। আমাদের উৎপাদনী ক্ষমতাই ধ্বংস হয়ে যাবে। অথচ এতো বড়ো বিষয়টা পিছনে চলে যাচ্ছে মানুষ সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলকে নিয়ে উত্তেজিত হয়ে পড়ায়। তাদের উত্তেজনা যথাযথ, কিন্তু এই উত্তেজনা তৈরি করাটাই ওদের কৌশল।

এই কথাগুলো কিন্তু আজ আমরা নতুন বলছি না—আমরা বারে বারে বলে আসছি এগুলো। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলিলে এটা পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন এটাকে সামনে আনার উপায়টা কী? উপায় হচ্ছে এর উৎসটা যে সামগ্রিক ভাবে এক, সেটা চিহ্নিত করা আর তাকে মানুষের চেতনার মধ্যে নিয়ে যাওয়া। আক্রমণের উৎস হচ্ছে পুঁজিবাদের সঙ্কট। সে তার এই সঙ্কটের মধ্যে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধকে নানা ভাবে ধ্বংস করে দিতে চায় নানা বিভাজনকারী প্রক্রিয়ায় মানুষের নজর ঘুরিয়ে দিয়ে এবং এই কাজ করতে গিয়ে হেন কাজ নেই, যা তারা করতে পারে না। কার্ল মার্কসও এই কথা বলে গিয়েছিলেন যে পুঁজিবাদ তার মুনাফার জন্যে নিম্নতম স্তরেও নেমে যেতে পারে, প্রয়োজনে নিজেকে ফাঁসীও সে দিতে পারে। কী করে ২২ তারিখ রামলীলা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী বললেন যে কখনোই এন আর সি নিয়ে আলোচনা ক্যাবিনেটে হয়নি? নাটক করে তিনবার 'ঝুট' কথাটা উচ্চারণ করলেন, অথচ পার্লামেন্টের রেকর্ডে আছে, তাঁর হোম মিনিস্টার বলছেন সারা দেশে এন আর সি হবে। সংসদের যৌথ সভায় রাষ্ট্রপতি যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন, সেখানে রেকর্ডে আছে যে এন আর সি হবে, আর ইনি বলছেন ২০১৪ থেকে ওনার ক্যাবিনেটে এন আর সি কখনো আলোচনাতেই আসেনি! পত্রিকাগুলো সরাসরি বলতে ভয় পেল যে উনি মিথ্যা কথা বলছেন। অথচ ওনার মিথ্যা বলার কোনো সীমা নেই। গোয়েবলসকে এক্ষেত্রে উনি অনুসরণ করছেন—"এক মিথ্যা বহুবার বলতে থাকলে মানুষ এক সময়ে বিশ্বাস করতে শুরু করবে"।

এই জায়গায় দাঁড়িয়ে খেলার নিয়ম-কানুন খুব দ্রুত পালটে যাচ্ছে আর তার জায়গা নিচ্ছে লজিক নয়, পারভারশন। মূলধনী পণ্য সূচক পড়ে গিয়েছে ২১.৯ শতাংশ। তার মানে অন্যান্য ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়ছেই। দেশের উৎপাদন ক্ষেত্র লাগাতার ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বেকারিতে কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির হার মাত্র ০.৮ শতাংশ অথচ জন্মের হার ১.৭ শতাংশ। একটা চূড়ান্ত বিকৃতি তৈরি হয়ে যাচ্ছে অর্থনীতির মধ্যে। যখন অর্থনীতিতে মিনিমাম ওয়েজ বাড়ানোর মাধ্যমে আরও বেশি অর্থ যোগানের দরকার, তখন এরা ইকনমি থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে কর্পোরেট ট্যাক্স কমানোর মধ্যে দিয়ে। বলছে এভাবেই নাকি বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া যাবে। বিনিয়োগ করা তো রিলিফের সঙ্গে সংযুক্ত নয়! তখনই বিনিয়োগ হবে, যখন তার থেকে রিটার্নের সম্ভাবনা থাকবে। ১০০ টাকা দিয়ে ১২৫ টাকা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেই মানুষ ১০০ টাকা লাগাবে। সাধারণ যুক্তিবোধ যখন এই কথা বলছে, তখন টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে ইকনমির থেকে কর্পোরেটদের পাইয়ে দেওয়ার জন্য কারণ তারা ইলেক্টোরাল বন্ডে চাঁদা দেয়। এটা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় এক ধরনের বিকৃতি। সঙ্কটগ্রস্ত অবস্থায় এই পর্বত প্রমাণ বিকৃতির মধ্যে দিয়েই এখানকার বুর্জোয়াজি টিকে থাকার চেষ্টা করছে, আর বিকৃতিটা ট্রান্সফার্ড হয়ে যাচ্ছে পলিটিক্সে। এই কারণেই এন আর সি, এন পি এ ইত্যাদির অবতারণা যাতে নজরটা অন্যদিকে চলে যায়। বিকৃত হয়েই দেশের এম এল এ, এম পি-রা গরু-ঘোড়ার মতো বিক্রি হচ্ছে। একই বিকৃতি সমাজেও প্রতিফলিত হচ্ছে। সামাজিক অপরাধ আগেও ঘটতো, কিন্তু এখনকার নির্মমতা আগের সব কিছুকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ধর্ষণ করে পুড়িয়ে দেওয়াই শুধু নয়, তাকে জ্বালিয়ে দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনাও এখন ঘটছে। টোটাল পারভারশন। মানুষের মূল্যবোধকে কমিয়ে দেওয়াও পুঁজিবাদের আক্রমণাত্মক রূপের একটি দিক। এটাকেও আমাদের চিহ্নিত করা দরকার। শত্রুর কৌশল যদি আমার উপলব্ধিতে নিয়ে আনতে না পারি, তাহলে তার বিরুদ্ধে মোকাবিলা গড়ে তোলা মুশকিল।

এই সামগ্রিকতায় দাঁড়িয়েই আজ দেশের সব কয়টি ট্রেড ইউনিয়ন এক ভাষায় কথা বলছে। অনেক রাজনৈতিক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিল এর আগে, কিন্তু যেদিন সিটিজেন অ্যামেন্ডমেন্ট বিল পাশ হলো, তার দুদিনের মধ্যেই টেলিফোনে আমরা পরস্পরের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলাম ৮ জানুয়ারির ধর্মঘটে এই বিষয়টিকেও যুক্ত করে নেওয়ার, কারণ এটি একটি জনবিরোধী, দেশ-বিরোধী, সংবিধান বিরোধী প্রক্রিয়া। সবাই সহমত পোষণ করেছে। ঐক্যবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের এই উপাদানটার জন্ম হচ্ছে। কিন্তু এটাকে কাজে লাগাতে গেলে একে নিচের তলায় নিয়ে যেতে হবে আর সেই নিয়ে যাওয়ার বাহক হচ্ছেন আপনারা, আপনাদের সংগঠন, বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন। এটা কতখানি করতে পারছি বা করতে পারার কতখানি ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করতে পারছি আমার সংগঠনের মধ্যে, কতখানি সক্রিয় করতে পারছি আমার ইনফ্রাস্ট্রাকচারকে—অবশ্যই সম্মেলন এই বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করবে আজকের রাজনৈতিক, সাংগঠনিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে সামনে রেখে। আমি শুধু এই বিষয়টায় আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

চতুর্থত, আজকের লড়াই একটা নতুনতর মাত্রা পাচ্ছে। আপনারা আপনাদের রিপোর্টে আলোচনা করেছেন যে চিঠি দিচ্ছেন, কিন্তু সরকার তার প্রাপ্তি স্বীকার করছে না। একটা প্রথা ছিলই যে কেন্দ্রে পে-কমিশন হয়ে গেলে রাজ্যেও তাকে প্রসারিত করতে হবে। কেন্দ্রের বহু পরে এখানকার সরকার কিছু একটা করেছে, কিন্তু তা অসম্পূর্ণ। মহার্ঘ ভাতা দিচ্ছে না। প্রতিবাদ করলে পাত্তা দিচ্ছে না। কোথাও তো যেতে হবে এখান থেকে আমাদের! এই জায়গায় তো ছেড়ে দেওয়া যাবে না।

কখনো না কখনও তো সংঘাতের ব্যাপারটা ভাবতে হবে আর তার প্রস্তুতি গড়ে তুলতে হবে। সেই প্রস্তুতি গড়ে তোলার এটাই হচ্ছে মঞ্চ। তা না হলে আবার বলবো যে "হতাশা এসেছে" আর সেই হতাশার সুযোগ নিয়ে চরম দক্ষিণ পন্থী শক্তি পালের হাওয়াটা কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। আমি জানি না আপনারা লক্ষ্য করছেন কিনা, কিন্তু আমি এ শ্রীকুমারের সাথেও আলোচনা করে দেখলাম সারা দেশজুড়েই নতুন পেনশন ব্যবস্থা নিয়ে একটা সমান্তরাল মঞ্চ তৈরি হয়ে গেছে এবং এই মঞ্চের আক্রমণের লক্ষ্য কিন্তু যারা এটা চাপিয়েছে তারা নয়, আক্রমণের লক্ষ্য হচ্ছে মূল ধারার শ্রমিক আন্দোলন। এই ধরনেরই আর একটি মঞ্চ হয়েছে ব্যাঙ্কে 'উই দি ব্যাঙ্কারস' নাম দিয়ে। এরা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন হিসেবে সংগঠিত না এবং এদের একমাত্র অ্যাজেন্ডা "সব ইউনিয়নই খারাপ"। শাসক শ্রেণীর ষড়যন্ত্রের গভীরতাটা চিন্তা করুন। হতাশাকে অবলম্বন করে মানুষকে যদি ট্রেড ইউনিয়নের মূল ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া যায়, "সব ট্রেড ইউনিয়ন এক ন্যায়েসা হ্যায়... নেতা-গিরি করতা হ্যায়... কুছ নেহি করতা হ্যায়"-এর মতো যদি ন্যারেটিভ তৈরি করে দেওয়া যায়, তাহলে কার সুবিধা হবে? সুবিধা হবে অবশ্যই শাসক শ্রেণীর।

সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়নই এই মুহূর্তে সমাজের মধ্যে সবচেয়ে সংগঠিত প্রতিরোধের শক্তি। সুতরাং সেটাকে গুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা থাকবেই এবং আমাদেরও এ ব্যাপারে সিরিয়াসলি চিন্তা-ভাবনা করতে হবে, দেখতে হবে হতাশা যেন না আসে। সরকার করতে চাইছিল না, তারপর কিছুটা করলো। একে আন্দোলনের জয় হিসেবে চিহ্নিত করে পরের জয়টা ছিনিয়ে আনার জন্য আমাদের কোথাও একটা যেতে হবে। কিছুটা সংঘাত, কিছুটা আক্রমণের জায়গায় পেতে যেতে হবে—কতটা যাবেন, কোন স্তর অবধি যাবেন, সেটা আপনারা ঠিক করবেন আপনাদের সংগঠনে দাঁড়িয়ে কিন্তু হতাশা আসতে দিলে চলবে না এবং নজর রাখতে হবে কোনো সুযোগ যেন দক্ষিণ পন্থীরা নিতে না পারে। মূল ধারার ট্রেড ইউনিয়ন থেকে অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মীরা যেন বিচ্ছিন্ন না হয়। সব সেক্টরেই এদের টার্গেট হচ্ছে অপেক্ষাকৃত নবীন কর্মীরা। রেল বলুন, কেন্দ্রীয় সরকারের বলুন বা অল ইন্ডিয়া স্টেট গর্ভমেন্ট এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের আন্দোলনেই বলুন---সব জায়গাতেই আলাদা আলাদা মঞ্চ তৈরি করে রেখেছে শত্রুরা। এরাই ভোটের সময়ে সক্রিয় হয়ে নোটায় ভোট দেওয়ার ডাক দিয়েছিল। এটা একটা রাজনৈতিক চাল এবং আর এস এস আছে এদের পরিচালনার পেছনে। তাদের ষড়যন্ত্রের এটাও একটা অভিমুখ। দেখতে হবে আমরা এদের চিহ্নিত করতে পারছি কিনা আর সেই জন্যেই কিছু আক্রমণাত্মক কর্মসূচীর প্রয়োজন---এটাও আপনারা বিচার-বিবেচনা করে দেখবেন।

আপনাদের সংগঠনের যে গৌরবময় ইতিহাস আছে, তাতে এর আগেও বহুবার এরকম পরিস্থিতিতে আক্রমণাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে আপনারা সারা দেশের সব রাজ্যকেই পথ দেখিয়েছেন। আমি জোর দিয়ে বলবো যে, '৭০-'৭১-এর আধা ফ্যাসিস্ট পরিস্থিতিতে বাংলায় বন্ধের পর বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সেগুলিতে সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত, সবচেয়ে সফল ভাবে অংশগ্রহণ করছেন রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা। আমরা সেই সময়ে নতুন এসেছি আন্দোলনে। স্ট্রীট কর্নার করছি। দেখেছি ৩১১ ধারায় অত জন নেতা বরখাস্ত হয়ে গেলেও আপনারা পিছপা হননি। কত বড় শক্তি ধরে ট্রান্সফার আজকে? আমি আশা করবো আপনারা এ ব্যাপারে আত্ম-মন্থন করবেন এখানে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে। এই জায়গাটা ব্রেক করা দরকার, নইলে হতাশা কিন্তু সমস্ত নষ্ট করে দিয়ে চলে যাবে। সেটা আটকানো দরকার। কিভাবে সেটা করতে হবে, সম্মেলনে সেই নিয়ে সত্যি সত্যিই আত্ম-মন্থনের প্রয়োজন।

আমাদের আন্দোলনও কিন্তু একটা নতুন স্তরে প্রবেশ করছে। এখানে দাঁড়িয়ে এই সবক'টা বিষয়কে রিলেট করতে হবে। "আজ তোমার হাতে কাজ নেই, সেই কারণে এন আর সি এসেছে যাতে কাজ না থাকার কারণটাকে তুমি চিহ্নিত করতে না পারো, তোমার মূল শত্রুকে তুমি চিহ্নিত করতে না পারো আর তার বিরুদ্ধে আক্রমণ করতে না পারো"—এই ব্যাপারটাকে রিলেট করতে হবে। আবার এই রিলেট করার পর তাকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার স্কিলটাও আমাদের রপ্ত করতে হবে সংগঠনের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত। মিডিয়া আপনার সাথে নেই। তারা প্রতিদিন মানুষকে ভুল বোঝানোর কাজে ব্যস্ত। আপনাদের সংগঠন এখন মানুষের শরীরের শিরার মতো রাজ্যের প্রতিটা প্রান্তে ছড়িয়ে আছে। আপনাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারের জন্য জমি তৈরি আছে। এখন ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা তৈরি করে নিতে হবে শুধু। তারপর সমগ্র বিষয়টা আপনাদের নিয়ে যেতে হবে শুধু আপনাদের কর্মচারীর মধ্যে নয়, আশেপাশের মানুষের মধ্যেও। সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের এটাও একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

এই কাজটা আপনাদের সংগঠন ইতোপূর্বে করেছে। আমার মনে আছে, এমারজেন্সির সময়ে ১২ই জুলাই কমিটি একটা গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ ছিল। তখন গ্রামের দিকে, জেলাগুলিতে ১২ই জুলাই কমিটির মঞ্চই ব্যবহৃত হতো বামপন্থী আন্দোলনের জন্য, তার প্রচার এবং অন্যান্য কাজ সংগঠিত করার জন্য। এরকম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আপনারা বরাবর পালন করেছেন। আপনারা অভিজ্ঞ। দরকার শুধু আপডেট করার। আজকে সেই কাজটাই করতে হবে এবং নিচের তলায় সেই কাজ করার ক্যাপাসিটি তৈরি করতে হবে। সেই লক্ষ্যে আপনাদের পরিকল্পনা সম্মেলনে আলোচনা করে নিতে হবে। হতাশার কোনো জায়গা নেই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসেবে আক্রমণ আসবে, দমন আসবে। এগুলোকে মোকাবিলা করেই ভবিষ্যতে এগুলোর সম্ভাবনা চিরতরে আমরা বন্ধ করে দিতে পারবো। গত শতাব্দীর ৭০ থেকে ৭৭ সাল দমন এবং আক্রমণের কাহিনী। কিন্তু তাতেও আন্দোলন থেমে থাকেনি। ৭৭-এর পরে একটা নতুন অবস্থা এসেছে, যখন ধর্মঘট করলে চাকরি ছেদ করতে পারবে না—এটা আইনি অধিকার হিসেবে অর্জন করা গেছে। ৭০ থেকে ৭৭ লড়াইতে না থাকলে ৭৭ পরবর্তী পর্যায়ে আপনারা এই অধিকার পেতে পারতেন না, পাওয়া সম্ভব ছিল না, সেই রাজনৈতিক সমীকরণই তৈরি হতো না। ৭০ থেকে ৭৭ আপনাদের যে হার না মানা লড়াই, ছাঁটাই ইত্যাদি উপেক্ষা করে আপনাদের যে ধারাবাহিক লড়াই, তার সাথে শ্রমিকদের লড়াই, কৃষকদের লড়াই, ছাত্র-যুবদের লড়াই---তার ওপর দাঁড়িয়েই ৭৭-এর ইতিহাস তৈরি করার জমি তৈরি হয়েছে। একদিনে সেটা হয়নি। আপনাদের রিপোর্টে লেখা আছে বামফ্রন্টের সময়ের সাফল্যগুলিকে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া দরকার—অবশ্যই দরকার সেটা। আজ যদি আবার সেই গৌরবময় দিনগুলিতে প্রত্যাবর্তন করতে হয়, তাহলে আবার আন্দোলনকে আক্রমণাত্মক জায়গায় নিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই, কোনো শর্ট কাট নেই। কোনো কৌশল এখানে কাজ করবে না। কখন কাকে বন্ধু মনে করবো, কখন কাকে শত্রু মনে করবো—এই আলোচনা কোনো ফল এনে দিতে পারবে না এই মুহূর্তে, যদি সমস্ত শ্রেণী বন্ধুকে এক জায়গায় নিয়ে এসে শ্রেণী শত্রুদেবকে খোলাখুলি আক্রমণের জায়গায় আমরা না যেতে পারি। কত দূর আক্রমণের যেতে পারবো, এই মুহূর্তে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সামনেও সেটাও একটা বড়ো প্রশ্ন সন্দেহ নেই, কিন্তু পথ এটাই। আবার সবাই মিলে চেষ্টা করলে পারা যাবে না, এমনটাও নয়। পৃথিবীর কোনো দেশেই শ্রমিক আন্দোলন শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়নি। মার খেয়েছে, পিছু হঠেছে, কখনও কখনও ছোটো ছোটো লড়াইয়ে পরাজিতও হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধটা তারাই জিতেছে। এটাই অনিবার্যতা। এই বিশ্বাসে ভর করেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে এবং তারপর একশো বছর পেরিয়েও গেছে।

আক্রমণ এখন আসছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টার্গেট করে এবং তার প্রাথমিক পর্যায়ে আসছে সমস্ত শ্রম আইনের ওপর আক্রমণ। নয়া শ্রম আইনের চারটি কোডই পার্লামেন্টে পেশ হয়ে গেছে। এর মধ্যে ওয়েজ কোড বিল পাশও হয়ে গেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশনস-এ যে কোড রাখা হয়েছে, তাতে বস্তুতপক্ষে ধর্মঘটের অধিকারকেই বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যে মুহূর্তে আপনি ধর্মঘটের নোটিশ দেবেন, সেই মুহূর্তেই কনসিলেশন শুরু হয়ে গেছে ধরে নেওয়া হবে, তার মিটিং ডাকা হোক আর না হোক এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না কনসিলেশন সমাপ্ত হচ্ছে, ধর্মঘটটা বেআইনি হবে। নিশ্চিত ভাবেই কনসিলেশন অফিসার মিটিং ডাকবেন না, ডাকলেও তা সমাপ্ত হবে না—তার মানে ধর্মঘটও করা যাবে না। যে সমস্ত শর্ত থাকছে এতে, তাতে ট্রেড ইউনিয়ন করাটাই কঠিন হয়ে পড়বে। এই কোডে যে কোনো কর্মীর সার্ভিস কন্ডিশন একতরফা ভাবে মালিক পরিবর্তন করে দিতে পারে। এ কাজ করতে গেলে মাত্র ২১ দিনের একটা নোটিশ দিতে হবে এবং সেই ২১ দিনের মধ্যে যদি সরকার আপত্তি না করে, তাহলে সেই পরিবর্তন হয়ে গেছে বলে ধরে নিতে হবে। এটা আগে ছিল না। ইউনিয়নের ডিসপিউট করার অধিকার ছিল, লড়াই করার অধিকার ছিল। এখন এক তরফা অধিকার দিয়ে দেওয়া হয়েছে মালিকদের।

কাজের ঘণ্টার ব্যাপারেও নতুন কথা-বার্তা বলছে এরা। ফ্যাক্টরি অ্যাক্টে ছিল ৮ ঘণ্টা কাজের কথা, এখন নতুন আইনে বলছে সরকার যা ঠিক করবে, সেটাই হবে দৈনিক কাজের সময়। এইভাবে আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত একটা অধিকারকে কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও আছে আরও। ধরা যাক কোনও কারণে আপনি দুই হাজার টাকা বেশি বেতনের অধিকারী হলেন। নতুন আইন বলছে দু'বছর বাদে সরকার যদি মনে করে তো সেই টাকা কমিয়েও দিতে পারে,

সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

১৯তম রাজ্য সম্মেলনে মহিলারা

অষ্টাদশ রাজ্য সম্মেলন পরবর্তী তিনটি বছরে সমাজের সমস্ত স্তরে মহিলাদের তথা কর্মচারী সমাজেও মহিলাদের ওপর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আক্রমণের মাত্রা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। সাথে সাথে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলন সংগ্রাম-এর মাত্রাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনই একটি পরিস্থিতির মধ্যে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯তম রাজ্য সম্মেলন অত্যন্ত সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৫-২৭শে ডিসেম্বর '১৯, বর্ধমান শহরে কমরেড অজয় মুখার্জী নগরে এবং কমরেড সুকোমল সেন মঞ্চে (সংস্কৃতি মঞ্চ)। এই সম্মেলন সফলতার শীর্ষে নিয়ে যেতে মহিলাদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য।

গত ১৪ জুলাই '১৯ বর্ধমানে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে মোট ৯টি উপসমিতি গঠিত হয়, যার মধ্যে অন্যতম একটি উপসমিতি হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবক উপসমিতি। এই উপসমিতির আহ্বায়িকা কমরেড ছায়া মণ্ডল, ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের বর্ধমান জেলার সম্পাদিকা। স্বেচ্ছাসেবক উপসমিতিসহ আরো আটটি উপসমিতিতে মোট ৫০ জন মহিলা যুক্ত হন, নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন সহ অন্যান্য বিভিন্ন সমিতির মহিলা কমরেডরা। যার মধ্যে সেটেলমেন্ট কর্মচারী সমিতি, কৃষি কারিগরী কর্মচারী সমিতি (K.K.K.S) উল্লেখযোগ্য। অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের পর থেকে স্বেচ্ছাসেবক উপসমিতি মোট ৩টি সভা এবং অন্যান্য উপসমিতিগুলিও ৩টি সভা করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

সম্মেলনকে সার্বিক সফল করার লক্ষ্যে অভ্যর্থনা কমিটি গঠনের দিন যে দানমেলার আয়োজন বর্ধমান জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি করে সেখানেও মহিলাদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র ও.বে. নার্সেস এ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকেই ঐদিন ১ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা উঠে আসে, ৩৬ জন কর্মচারীর অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে, এছাড়াও পরিবার পরিজনের থেকে ১৭ হাজার টাকা ওঠে। অন্যান্য সমিতির মহিলারাও এই দানমেলায় অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনকে কেন্দ্র করে শুধুমাত্র মহিলারা টিম করে বিভিন্ন দপ্তরে দপ্তরে কর্মচারীদের কাছে প্রচার করেন, যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহিলা সেচ্ছাসেবকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন মহিলা আবাসনে। সেখানে মহিলা প্রতিনিধিদের যেন কোনো অসুবিধা না হয়। এছাড়াও হলে এবং মঞ্চেও সম্মেলন চলাকালীন মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরা প্রতিনিয়ত পরিশ্রম করেছেন, যা অত্যন্ত সংগ্রামী মানসিকতার পরিচয় রাখে।

এই ১৯তম রাজ্য সম্মেলনে বিভিন্ন সমিতি থেকে মোট ৬৩ জন মহিলা প্রতিনিধি উপস্থিত চিলেন। দুঃখের হলেও সত্যি যে, এই ৬৩ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন মহিলা বক্তব্য রাখেন। ও. বে. নার্সেস এ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদিকা নিবেদিতা দাশগুপ্ত এবং হাইকোর্ট কর্মচারী সমিতির পক্ষে সংগঠন সম্পাদিকা অপর্ণা তলাপাত্র। দু'জনেই খুব দৃঢ়তা ও দক্ষতার সাথে প্রতিবেদনের উপর পরিস্থিতি ও সংগঠন সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। তাঁদের বক্তব্যেও উঠে আসে আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২০, সর্বভারতীয় ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তাও সফল করার দৃঢ় অঙ্গীকার। পাশাপাশি নিজেদের চেতনাকে আরো পরিপূর্ণ করে যথাযথভাবে তৈরি করা ও বিভিন্ন সংগ্রাম আন্দোলনে আরো বেশি করে অংশগ্রহণের আহ্বানও রাখেন।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ১৯তম সংগ্রামী সম্মেলন মঞ্চও আশা ও দাবি রাখে যে আগামী দিনে মহিলাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে ও সমস্ত সমিতিকে দৃঢ় ও শক্তিশালী করতে নেতৃত্বরা যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্মেলনের অনুলিখন কমিটির প্রায় সমস্ত সদস্যই ছিলেন মহিলা। কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর এই সিদ্ধান্তকে উপস্থিত প্রতিনিধিরা অভিনন্দন জানিয়েছেন। □

কুমকুম মিত্র

রাজ্য সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

(১) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্মরণে, (২) সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীন বিদেশনীতি রক্ষার পক্ষে, (৩) সর্বভারতীয় দাবিদাওয়া প্রসঙ্গে, (৪) কৃষি ও কৃষকের সঙ্কট এবং সংগ্রাম, (৫) দেশের সংবিধান ও অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার দাবিতে (৬) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নাগরিক অধিকার হরণের চক্রান্তের বিরুদ্ধে (৭) রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে (৮) শ্রম আইন সংস্কারের নামে ট্রেড ইউনিয়ন অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে, (৯) উগ্র হিন্দুত্ববাদ সহ সমস্ত ধরনের ধর্মীয় মৌলবাদের বিরুদ্ধে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র রক্ষার দাবিতে, (১০) শ্রমজীবীদের ঐক্য বিরোধী বিভেদপন্থী পরিচিতি সত্তার রাজনীতির বিরুদ্ধে (১১) বিভিন্ন স্ব-শাসিত ও গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের ওপর হিন্দুত্ববাদী নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের চেষ্টার বিরুদ্ধে, (১২) শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য, সন্ত্রাস ও গৈরিকীকরণের প্রতিবাদে, (১৩) সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ও সুস্থ সংস্কৃতির পক্ষে, (১৪) কর্পোরেট পুঁজি পুষ্ট মিডিয়ার জনবিরোধী ভূমিকার প্রতিবাদে, (১৫) সমস্ত ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য ও নারীদের ওপর আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার দাবিতে, (১৬) কাশ্মীর সমস্যার স্থায়ী সমাধানের দাবিতে, (১৭) পরিবেশ ও জলসম্পদ রক্ষার স্বার্থে, (১৮) রাজ্য স্তরের দাবি দাওয়া প্রসঙ্গে, (১৯) রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার দাবিতে এবং স্বৈরাচারী আক্রমণের বিরুদ্ধে, (২০) প্রশাসনে আধুনিকীকরণের নামে চুক্তির মাধ্যমে নিয়োগের বিরুদ্ধে ও শূন্যপদে স্থায়ী নিয়োগের দাবিতে, (২১) অনিয়মিত চুক্তি প্রথায় নিযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিতকরণ এবং সমকাজে সমবেতনের দাবিতে, (২২) ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কর্মচারী স্বার্থে চালু করা এবং কেন্দ্রীয় হারে প্রাপ্য বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান ও এই অর্জিত অধিকারের ন্যায়সঙ্গত স্বীকৃতি প্রদানের দাবিতে, (২৩) নীতিহীন, হয়রানিমূলক ও প্রতিহিংসাপরায়ণ বদলির বিরুদ্ধে। □

রাজ্য সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণ

▶ *ষষ্ঠ পৃষ্ঠার পর*

তার জন্যে নতুন করে সংসদে কোনো বিল আনতে হবে না। অর্থাৎ এটা একটা একমুখী ব্যবস্থা হতে চলেছে। যে কোনো আইনেরই একতরফা ভাবে বদলে যাওয়ার অধিকার সরকার নিজের হাতে রাখতে চাইছে। সংসদে বিতর্কের মাধ্যমে কোনো কিছু গ্রহণ করার ব্যবস্থাটাই তারা তুলে দিতে চাইছে, আর তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে শ্রম আইনের বদলের মধ্যে দিয়ে।

আমরা একটা নতুন জমানায় ঢুকে পড়ছি, যেখানে সরকার সব কিছুরই পরিবর্তন করতে চাইছে গণতন্ত্রের তোয়াক্কা না করে। তো এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কী করবো? ধর্মঘট করা যাবে না বললে ধর্মঘট করা ছেড়ে দেবো? ট্রেড ইউনিয়ন করা কঠিন হবে বলে কর্মীদের সংগঠিত করা ছেড়ে দেবো? কখনই না! এই ব্যাপারে আমাদের শক্তি যোগাবে আমাদের গত একশো বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ইতিহাস। এই ইতিহাসকে সামনে এনে আমাদের আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করেছেন আপনাদেরই আন্দোলনের পথিপৃৎ কমরেড সুকোমল সেন। তাঁর বই এক্ষেত্রে অমূল্য। তিনি দেখিয়েছেন রেল শ্রমিকদের ইউনিয়ন তৈরি হওয়ার আগে থেকেই তাঁদের ধর্মঘটের ইতিহাসের শুরু। টেক্সটাইল শ্রমিকদের ইউনিয়ন শুরুর থেকেই তাঁরা ধর্মঘটের সাথে জড়িত। আমরা জানি, ধর্মঘটের অধিকার শ্রমিক শ্রেণীকে কেউ দেয়নি, এই অধিকার তাঁরা নিজেরাই নিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে সমাজকে বাধ্য করেছেন এই অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে। আজ ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশনের একাধিক কনভেনশন 'রাইট টু স্ট্রাইক'কে স্বীকৃতি দিয়েছে। প্রায় একশো বছরের ধর্মঘট পালনের পর এটা এসেছে। এই জায়গা থেকেই ধর্মঘটের অধিনার না ছাড়ার শিক্ষা আমাদের নিতে হবে। যদি আইনে না মানে তাহলে আইন ভেঙেই আমাদের ধর্মঘটে যেতে হবে এবং এই জায়গায় আমরা ধীরে ধীরে আসছি। বিনা ধর্মঘটে শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন এই মুহূর্তে এগোতে পারে না। আমার হাতিয়ার আমার শ্রম আর এই শ্রমকে প্রত্যাহার করে আমি মালিক শ্রেণীর ওপর চাপ সৃষ্টি করি—ধর্মঘট এটাই!

গত পাঁচ বছরে নরেন্দ্র মোদির সরকার ঠিক করেছিল প্রায় পনেরটি সংস্থা বিক্রি করে দেবে। বি ই এম এল, অ্যালয় স্টিল প্ল্যান্ট, সালেম স্টিল, ব্রিজ অ্যান্ড রুফ ইত্যাদির মতো সংস্থা এগুলোর মধ্যে ছিল। সরকার টেন্ডার ডাকার সাথে সাথে সেই সব জায়গায় আন্দোলন শুরু

অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক করালী চ্যাটার্জী

হয়ে গেছে। যারা টেন্ডার জমা দিতে এসেছে, কর্মীরা তাদের ভাগিয়ে দিয়েছেন। একাধিক বার ঘটেছে এমন ঘটনা। শেষ পর্যন্ত কোনো টেন্ডারই জমা পড়েনি। শ্রমিকদের আন্দোলন তাদের আশঙ্কিত করে তুলেছে। বেসরকারিকরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন এখন এই পর্যায়ে ঢুকে গেছে—প্রতিরোধের জায়গায় এসে গেছে। এই করে বিগত পাঁচ বছরে ওদের কর্মসূচী আমরা পালন করতে দিইনি। দ্বিতীয় দফায় এসে এ কাজ তারা ফের শুরু করেছে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত সফল হতে পারেনি। আজকের দিনে সরকারের কাছে আবেদন জানানোর কোনো জায়গা নেই বেরসরকারিকরণ বন্ধ করার জন্যে। আজকে এমন দিন এসে গেছে, যখন আমরা বলছি, ''চেষ্টা করে দেখ, আমরা করতে দেবো না''। যেখানে যেখানে আমরা এই মুড তৈরি করতে পারবো, সেখানে সেখানেই ওদেরকে বেসরকারিকরণে থামিয়ে দিতে পারবো, আর যেখানে পারবো না, সেখানে এটা হয়ে যাবে। ৮ জানুয়ারির ধর্মঘটে একই সঙ্গে বেসরকারিকরণের হামলা, অধিকার কেড়ে নেওয়ার হামলার সাথে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিলের হামলা, এন পি আর, এন সি আরের হামলার বিরুদ্ধে লড়ার কথা রয়েছে। আজ স্লোগান উঠেছে কাগজ না দেখানোর। কিন্তু একে রূপায়িত করার ব্যাপার আছে, প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপার আছে। ডিটেনশন ক্যাম্প আর এন আর সি-র ব্যাপারে যেখানেই টিম যাবে, সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তোলার ব্যাপার আছে। এই জায়গায় যদি যেতে হয়, তাহলে সংগঠনের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত এই মানসিকতাটা গড়ে দিতে হবে আর সেটা আপনা আপনি হবে না। আপনা আপনি কিছু হয় না, হওয়াতে হয়। সমাজতন্ত্র গঠন অনিবার্য, পুঁজিবাদের পতন কেউ ঠেকাতে পারে না—কিন্তু সেটাকে ঘটাতে হয়, নিজে নিজে হয় না। পৃথিবীকে ব্যাখ্যা করাই যথেষ্ট নয়, কথা হলো তার পরিবর্তন ঘটানোর। এটাই আমাদের সংগঠনের দর্শন, আমাদের রাজনীতির দর্শন, আমাদের মতাদর্শের দর্শন। আন্দোলনের একটা স্তর থেকে আর একটা স্তরে উন্নীত হতে হবে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। প্রতিরোধের থেকে আক্রমণের স্তরে যেতে হবে। আক্রমণের শপথ নিয়েই আগামী দিনের শ্রমিক আন্দোলনের রোডম্যাপ গড়ে তুলতে হবে। আপনাদের ক্ষেত্রেও চ্যালেঞ্জটা একই। সুতরাং তার প্রস্তুতি গড়ে তোলার দরকার।

আরও একটা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে, আর সেটা হচ্ছে, টেকনোলজির পরিবর্তন। রোবট দিয়ে কাজ চালানোর চেষ্টা হচ্ছে বহু জায়গায়। কিন্তু এটা ফলপ্রসূ হবে না, কারণ শ্রম ছাড়া উৎপাদন হয় না। যতই টেকনোলজির পরিবর্তন ঘটাক, শ্রম ছাড়া পরিষেবা চলতে পারে না। বোতাম টেপার জন্যেও একটা মানুষ চাই। রোবট চালাতে গেলেও একটা প্রোগ্রামিং দরকার এবং তার জন্যেও একটা মানুষ লাগে। যারা এগুলো করে, তারা পুঁজির মালিক নয়, তারা তাদের মেধা আর শ্রমকে ব্যবহার করে এ কাজ করে। আজ কগনিজেন্ট, ইনফোসিসে যে হামলা হচ্ছে, তারা কেউ মালিক নয়। যদি মনে করেন বিনা শ্রমে উৎপাদন হয়, তাহলে এখানে সম্মেলন করার দরকার পড়ে না। চেতনাকে এই জায়গায় পরিশুদ্ধ করে নিতেহবে, তবেই আমাদের আন্দোলন, সংগ্রাম, লড়াই, সংগঠনের প্রাসঙ্গিকতা থাকবে, নচেৎ প্রাসঙ্গিকতাই শেষ হয়ে যাবে। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে অমান্য এবং আক্রমণের মানসিকতা গড়ে তোলার দরকার শুধুমাত্র নিজের অধিকার রক্ষা করতে নয়, নিজের ওপর যে ক্রীতদাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে, সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য এটা করা দরকার একই সাথে দেশ এবং দেশের সংবিধানে বাঁচানোর জন্যেও।

এখনকার ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আমাদের ৭০ বছরের আর্থিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকেও নিলামে তুলে দেওয়া হয়েছে। আগে ডিফেন্স ডিল হতো কারিগরি হস্তান্তরের। আমরা মিগ বিমান কিনেছি, সাবমেরিন কিনেছি, পরে সেই বিমান বা সাবমেরিন নিজেরাই তৈরি করেছি কারিগরি হস্তান্তরের সুবাদে। তার রক্ষণাবেক্ষণ বা মেরামতি আমাদের দেশেই হয়েছে, অন্য কোনো সংস্থার কাছে হাত পাততে হয়নি আমাদের। আজ রাফায়েল বা ওই ধরনের কিছুর একটার বোতাম পাল্টানোর জন্যেও আমাদের ডেসাল্টের কাছে ছুটে যেতে হবে কারণ এগুলো কেনার সময়ে এমন কোনো ধরনের চুক্তি করা হচ্ছে না, যাতে সেগুলো আমাদের দেশেই করা যায়। এটা জাতীয় স্বার্থের প্রতি বিরাট বিশ্বাসঘাতকতা। এরকম কখনও হয়নি, অথচ তারাই আবার জাতীয়তার কথা বলছে, দেশপ্রেমের কথা বলছে, পুলওয়ামার কথা বলছে, আর আমরা বেকুব হচ্ছি। অথচ এই পুলওয়ামার ঘটনা ঘটার বহু আগে থেকে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি এগুলিকে তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে বারে বারে মানুষের সামনে তুলে ধরেছে, কিন্তু কোনো ফল হয়নি। এর কারণ আমরা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের চেতনায় নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পারিনি। আমরা তখন চোখের সামনে যাকে পেয়েছি, তার বিরুদ্ধেই লড়াই করে গিয়েছি। চেতনার পরিবর্তন, পরিপ্রেক্ষিতের পরিবর্তন, পরিপ্রেক্ষিতের উপলব্ধির পরিবর্তন দরকার। এটাই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে সবচেয়ে বেশি প্রাসঙ্গিক, তা না হলে উগ্র দক্ষিণ পন্থীরা হতাশাকে ব্যবহার করে কর্মচারীকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে মূল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ধারা থেকে। কর্মচারীকে এর থেকে রক্ষা করাও আমার আন্দোলনের কাজ। এটাকে উপলব্ধি করে আপনারা আলোচনা করবেন সম্মেলনে রিপোর্টের উপরে। কতটা পেরেছি, কতটা পারিনি বিচার করবেন। কতটা পারিনি-র ওপর জোর বেশি থাকার দরকার অবশ্যই। না পারাগুলোকে আগে পেরে নিয়ে আরও কিছু পারার দিকে আন্দোলনকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা আপনারা সেরে ফেলবেন এখানে—এটা আমি আশা করি। মনে রাখবেন শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, যে দর্শনকে সামনে রেখে সে আমাদের ওপর হামলা চালাচ্ছে, সে দর্শন টেকেনি। সে দর্শন বহুবার প্রযুক্ত হয়েছে পৃথিবীর ইতিহাসে এবং বার বার সে পরাজিত হয়েছে। হিটলার, মুসোলিনি আজ ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। অন্যদিকে যে দর্শন আমাদের লড়াইয়ে উদ্বুদ্ধ করে, আজ থেকে দেড়শ বছর আগে তৈরি হওয়া যে দর্শন পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডারে উজ্জ্বলতম সংযোজন, তা প্রতিদিন জিতে যাচ্ছে নানা ঘটনায়। এমনকি ফ্রান্সিস ফুকুয়ামাকেও বলতে হচ্ছে ভুল করে বলে ফেলা এন্ড অফ হিস্ট্রির কথা, বলতে হচ্ছে মার্কস সাহেবের বক্তব্যের সঠিকতার কথা ও আজকের দিনেও তার প্রাসঙ্গিকতার কথা। আমরা জিতবোই, কিন্তু আবার বলছি তা নিজে থেকে হবে না। জিতটাকে অর্জন করতে হবে আর সম্মেলন হোক সেই অর্জনের হাতিয়ারকে শান দেওয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। আমি আশা করবো চুলচেরা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ আলাপ আলোচনার মধ্য দিয়ে আপনারা আগামী দিনের রণনীতি তৈরি করবেন। আপনাদের আন্দোলন গোটা দেশের আন্দোলনেরই এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এই উপাদানকে শানিত করা এবং তাকে আন্দোলনের সামনের সারিতে নিয়ে আসা আজকের দিনে এক বিরাট চাহিদা। যদি দেশটাকে বাঁচাতে হয়, আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাঁচাতে হয়, যদি শ্রমিক শ্রেণীর ওপরে যে দাসত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে, তাকে প্রতিরোধ করতে হয়, তাহলে দরকার কেড়ে নেওয়া অধিকারকে পালটা আঘাত করে ফের ছিনিয়ে নেওয়া। এরই প্রস্তুতি আপনারা আপনাদের সম্মেলন গড়ে তুলবেন, এই আশা রেখে, এই ভরসা রেখে আপনাদের আন্দোলন-সংগ্রাম এবং রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি আবার সেই গৌরবময় ঐতিহ্যে প্রত্যাবর্তন ঘটাতে পারবে, এই আত্মবিশ্বাস রেখে, আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে, আপনাদের সম্মেলনকে বিধিবদ্ধ রূপে উদ্বোধন করার যে দায় আমার ওপর রেখেছেন, আমি নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করে তা আনুষ্ঠানিক ভাবে সম্পন্ন করছি। ধন্যবাদ। ইনকিলাব জিন্দাবাদ। □

অনুলিখন ঃ উৎসর্গ মিত্র

নতুন নেতৃত্ব

সম্মেলন থেকে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন—**সভাপতি**—আশীষ ভট্টাচার্য, **সহ-সভাপতি**—গীতা দে, প্রশান্ত সাহা, মানস দাস, **সাধারণ সম্পাদক**—বিজয় শঙ্কর সিংহ, **যুগ্ম সম্পাদক**—বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, **সহ-সম্পাদক**—অনুপ বিশ্বাস, দেবব্রত রায়, **দপ্তর সম্পাদক**— অভিজিৎ বোস, **কোষাধ্যক্ষ**— লিটন পান্ডে, **সংগ্রামী হাতিয়ারের সম্পাদক**—সুমিত ভট্টাচার্য, **সহযোগী সম্পাদক**—মানস কুমার বড়ুয়া। **সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য**— সুতপা হাজরা, রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়, অতনু মিত্র, প্রণব কর, সুমনকান্তি নাগ, জয়দেব হাজরা, প্রশান্ত চন্দ, সোমনাথ পোদ্দার, দেবলা মুখার্জী, শাশ্বতী মজুমদার, অসিত কুমার ভট্টাচার্য, বাণীপ্রসাদ ব্যানার্জী, তাপস চক্রবর্তী, দেবাশিস মিত্র, অমিত ব্যানার্জী। □

Editor : SUMIT BHATTACHARYA
SANGRAMI HATIAR

State Co-ordination Committee
48th Year, 8th Issue, December 2019

Regd. No. : 18484/71
Price : Two Rupees

৮ জানুয়ারি '২০-র দেশব্যাপী সফল সাধারণ ধর্মঘট, কাঁপন ধরালো শাসকের বুকে

শ্রমিক-কর্মচারী এবং সাধারণ মানুষ সম্মিলিতভাবে ৮ জানুয়ারি সাধারণ ধর্মঘটে শামিল হয়ে কেন্দ্রের নয়া উদার আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করলেন। একমাত্র আর এস এস নিয়ন্ত্রিত বি এম এস ছাড়া ১০টি কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও অর্ধ শতাধিক জাতীয় ফেডারেশন ১২ দফা দাবিতে এই ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়েছিল। দুশোর কাছাকাছি কৃষক সংগঠন এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছিল শুধু তাই নয়, তারা গ্রামীন এলাকায় বন্ধের ডাক দিয়েছিল। ঐদিন প্রতিবাদ প্রতিরোধের অনন্য নজির দেখলো গোটা দেশ এবং দুনিয়া। এর মধ্য দিয়েই যেন সূচনা হলো মোদি সরকারের জনবিরোধী ও বিভাজনের

ধর্মঘটের দিন তালা বন্ধ ব্যাঙ্কিং পরিষেবা

নীতির বিরুদ্ধে আরও বৃহত্তর সংগ্রামের।

এদিন সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে কেরালায়। শাসকদল ও প্রশাসনের যাবতীয় হুমকি, চাপ ও হামলাকে মোকাবিলা করে রুখে দাঁড়িয়েছে ত্রিপুরা। অন্যান্যবারের মতোই রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে ধর্মঘটকে বানচাল করার সব উদ্যোগ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঘট দারুণ সফল হয়েছে। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেও ধর্মঘটে ভালো সাড়া মিলেছে। সাড়া পড়েছে গুজরাটের শিল্পাঞ্চলে। উত্তরাখন্ডে প্রবল তুষাড় পাতের মধ্যেও ধর্মঘটে সমর্থনে রাস্তায় নামেন মেহনতী মানুষ। উত্তরপ্রদেশে যোগী সরকারের ব্যাপক জুলুমবাজি, বিভিন্ন এলাকায় ১৪৪ ধারা, সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই শ্রমিক-কৃষক ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নেন ধর্মঘটে। চোখে পড়ার মতো ধর্মঘট হয়েছে আসাম, বিহার, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্রে। ভালো ধর্মঘট হয়েছে কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, গোয়ার মতো বেশ কিছু রাজ্যে।

ধর্মঘটের দিন কনকনে ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে রাজধানী দিল্লীর শহীদ পার্ক থেকে শ্রমিক, ছাত্র, যুব, মহিলাদের মিছিল বাহাদুর শাহ জফর মার্গের কাছে গেলে পুলিশ মিছিলের পথ আটকায়। সেখানে অনুষ্ঠিত সভায় সি আই টি ইউ-র সাধারণ সম্পাদক তপন সেন বলেন, মোদি সরকারের ধ্বংসাত্মক নীতির বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের তুমুল ক্ষোভের প্রতিফলন হচ্ছে সর্বত্র। শ্রমিকরা ছাড়াও কৃষক, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীরাও রাস্তায় ধর্মঘটে। ধর্মঘটের পর আবার সব কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি বসবে এবং আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এই কর্মসূচীতে উপস্থিত ছিলেন আই এন টি ইউ সি নেতা অশোক সিং সহ অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন ও বিভিন্ন গণসংগঠনের নেতৃবৃন্দ। ছাত্রদের ৬০টি সংগঠন ছাড়াও বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা একযোগে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল একই দিনে।

এদিন দেশজুড়ে হয়েছে রাস্তা অবরোধ, রেল অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল। দেশ দেখেছে মেহনতী মানুষের অকুতভয় সংগ্রামী মেজাজ। এদিন বহুজাতিক সংস্থাসহ বেসরকারি ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য ধর্মঘট হয়েছে। টয়োটা, ভলভো বাসেস, ভলভো ট্রাক্স্, আই টি সি প্রভৃতি বড়ো বড়ো শিল্পক্ষেত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে।

এবারের ধর্মঘটের তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো আই টি সেক্টরের কর্মীদের অংশগ্রহণ। শুধু আই টি ই এস-এর কর্মচারীরা নয়, আই টি প্রফেশনালদের একটা অংশও এই ধর্মঘটে যোগ দিয়েছিল। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুত আই টি ইউ (কর্ণাটক আই টি / আই টি ই এস এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন) ধর্মঘটের সমর্থনে বিশাল মোটর বাইক মিছিল সংগঠিত করে। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩৫ শতাংশ আই টি কর্মচারী ধর্মঘটে শামিল হন। কেরালায় লেডি ইনফোপার্কের ইতিহাসে এই প্রথম উইপ্রো, টি সি এস, জেরক্সসহ অধিকাংশ আইটি কোম্পানিতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল অতি নগন্য।

কর্ণাটক ছাড়াও তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, মহারাষ্ট্র, বৃহত্তর দিল্লী, ঝাড়খণ্ডের শিল্পাঞ্চল ছিল বন্ধ। চট ও বাগিচা শিল্পে হয়েছে ব্যাপক ধর্মঘট। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলি হুমকি ফতোয়াকে উড়িয়ে দিয়ে ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। ডাক, আয়কর, অডিট অ্যাকডিন্টসের প্রায় ১৩ লক্ষ কর্মী অংশ নেন ধর্মঘটে। ব্যাঙ্ক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক ধর্মঘট হয়েছে।

একই দিনে কৃষক-খেত মজুরদের ডাকে সফল হয়েছে গ্রাম বন্ধ, ফসলের দেড়গুন দাম, সমস্ত কৃষকের ঋণ মকুব, ফসলের ক্ষয়ক্ষতি থেকে সুরক্ষা, বিপর্যয় সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ, বনাঞ্চল অধিকার আইন লাগুসহ অন্যান্য দাবিতে গ্রাম বন্ধের ডাক দিয়েছিলেন কৃষকরা। এছাড়া দেশজোড়া ছাত্র ধর্মঘটে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে।

শাসকের রক্তচক্ষুর তোয়াক্কা না করে রাজ্যে সর্বাত্মক ধমর্ঘট

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পাঞ্চল থেকে চা-বাগান সর্বত্র সফল ধর্মঘট হয়েছে। দুর্গাপুর, রানিগঞ্জ, আসানসোল, ব্যারাকপুর, হুগলি, হলদিয়া শিল্পাঞ্চল ছিল স্তব্ধ। বন্দরগুলিকে কাজ হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে আহুত ধর্মঘট ভাঙতে রাজ্যের শাসকদল কার্যত কেন্দ্রের শাসকদলের ভূমিকা নেয়। রাজ্য প্রশাসন, পুলিশ বেপরোয়াভাবে ধর্মঘটকে রুখতে চেষ্টা চালিয়েছে। কিন্তু সফল হতে পারেনি। তৃণমূলের অপশাসনে ক্ষুব্ধ মানুষ পথে নেমেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছে। শাসকদলের নানা প্ররোচনা, হুমকি সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানার শ্রমিক থেকে ছোট কারখানার শ্রমিক, আই সি ডি এস, মিড ডে মিলের কর্মী থেকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্পের কর্মী, চটকল শ্রমিক থেকে চা শ্রমিকরা মোদি সরকারের নীতির বিরুদ্ধে ধর্মঘটে অংশ নিয়েছে। এদিন ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে 'গুণ্ডামী'-র অভিযোগ আনেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরই পুলিশ প্রশাসন দ্বিগুন উৎসাহে ধর্মঘট ভাঙতে উদ্যত হয়। কলকাতাসহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ধর্মঘটের সমর্থনে পথে নামা মানুষদের গ্রেপ্তার করা শুরু হয়। গ্রেপ্তার হন বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী সহ একাধিক নেতা।

ধর্মঘটে অভূতপূর্ব সাড়া মিলেছে কলকাতায়। রাস্তায় সরকারী বাস চলেছে কিন্তু মানুষ ছিল না। দোকানপাট অধিকাংশই ছিল বন্ধ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও খোলা ছিল না। সবমিলিয়ে গোটা রাজ্যের জনগণের সংগ্রামী মেজাজের সাথে তালে তাল মিলিয়েছিল কলকাতা।

রাজ্য সরকার রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের ধর্মঘট থেকে বিরত রাখতে অতীতের মতোই কালো সার্কুলার জারি করে ৬ জানুয়ারি। বিজেপি শাসিত কোনো সরকার যা করে না, কেন্দ্রের নীতির বিরুদ্ধে ডাকা ধর্মঘটকে বানচাল করতে সরকারী কর্মচারী ও সরকারপোষিত কর্মচারীদের জন্য হুমকি ফতোয়া জারি করে রাজ্য সরকার। এবারেও ৬ জানুয়ারির ফতোয়ায় বলা হয় ৮ জানুয়ারি ছুটি বাতিল, না আসলে একদিনের বেতন কাটা যাবে ও ডায়াস নন হবে। এই হুমকিকে অগ্রাহ্য করে কর্মচারীরা রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও সহযোগী সংগঠনগুলির আহ্বানে ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। কেন্দ্রের ১২ দফা দাবির সাথে যুক্ত হয়েছিল কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরনের বিরুদ্ধে দাবি। শাসকের চোখ রাঙানীর তোয়াক্কা না করে রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা যে সাহসিকতার সাথে ধর্মঘটে সামিল হয়েছেন তার জন্য তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিজয় শঙ্কর সিংহ। □

১৯তম রাজ্য সম্মেলনের বিভিন্ন পর্ব

বর্ধমান টাউন হল ময়দানে সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশের একাংশ

গণসঙ্গীত পরিবেশন করছে সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম

সম্মেলনে প্রতিনিধি অধিবেশন চলছে

প্রগতিশীল পুস্তক বিক্রয় কেন্দ্রের উদ্বোধন করছেন প্রবীর মুখার্জী

সাধারণ সম্পাদকের বিবৃতি

৮ জানুয়ারি ২০২০, সর্বভারতীয় ধর্মঘটে সারা দেশের ন্যায় আমাদের রাজ্যেও ঐতিহাসিক ধর্মঘট হয়েছে। রাজ্যের সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘট সফল করার মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতার মুখোশকে উন্মোচিত করে দিয়েছে। রাজ্যের সরকারি কর্মচারীরা রাজ্য প্রশাসনের কালা সার্কুলার, রক্ত চক্ষুকে উপেক্ষা করে ধর্মঘটে শামিল হয়েছেন। এমনকি শাসক দলের হুমকিকে উপেক্ষা করে চুক্তির কর্মচারীরাও ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। যখন কর্মচারীরা শাসকদলের সাধারণ মানুষের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যাপক ধর্মঘট করছেন, তখন প্রশাসনের আধিকারিকদের ব্যবহার করে কর্মচারীদের অফিসে আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তদসত্ত্বেও কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করে ধর্মঘটকে সার্বিক ভাবে সফল করার জন্যে কর্মচারী সমাজকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বিজয় শঙ্কর সিংহ
সাধারণ সম্পাদক,
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি

সম্পাদক ঃ সুমিত ভট্টাচার্য
সহযোগী সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
যোগাযোগ ঃ দূরভাষ-২২৬৪-৯৫৯৩, ২২৬৫-০৯২৬ ফ্যাক্স ঃ ০৩৩-২২১৭-৫৫৮৮
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কোঃ অপঃ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিঃ ১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত।